The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব

[Influence of Islamic Culture on Personal & Social Life]

Dr. Muhammad Mahbubur Rahman
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 28 July 2024
Received in revised: 26 February 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:
Individual, Society, Islam, Culture.

ABSTRACT

Islam is a self-fulfilling philosophy of life. Islamic Tamaddun or culture is founded on the principles of this philosophy of life. Courteous behavior, manners, good deeds and good morals in the personal and social life of people, as prescribed by Allah Ta'ala is called Islamic culture. Islamic culture is not a national, clan or tribal culture; rather, it is human culture in the true sense. It includes welfare for all people irrespective of caste and language. Islamic culture is a culture that has the ability to spread globally. It has some basic aspects and some branching aspects. Tawhid, Risalat, Kitab and Akhirat are the basic aspects of Islamic culture. A person who believes in Tawhid, Risalat, Kitab and the Hereafter has included himself in the fold of Islamic culture. Salat, Zakat, Fast and Hajj are his basic acts of worship. Disciplinary aspects, ethical work Such as good qualities, welfare, self-sacrifice, kindness and love, forgiveness and generosity, maintaining relations of kinship, modesty and courage, shame, and creating sympathy, etc. are discussed in this article in light of the above philosophy.

১. ভূমিকা

ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম। ইসলামী সংস্কৃতি মূলত ইসলামী বিধি-বিধানের সামগ্রিক ফলিত রূপ যা পরিপূর্ণভাবে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইসলামী সংস্কৃতির অনুশীলন, অনুসরণ, রূপায়নের অর্থ হলো- বাস্তব জীবনে ইসলামের নীতি ও আদর্শের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিস্তৃত। সামাজিক জীব হিসেবে মানব চরিত্রের প্রতিটি দিকই ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। তথাপি আমরা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে যে সব বিষয়গুলো ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে উল্লেখ করে থাকি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উত্তম গুণাবলী, অপরের কল্যাণ কামনা, আত্মত্যাগ, দয়া-মায়া ও ভালোবাসা, ক্ষমা ও উদারতা, আত্মীয়তা, বিনয় ও নম্রতা, লজ্জা, সহানুভূতি সৃষ্টি। আলোচ্য প্রবন্ধে উক্ত বিষয়গুলো কুরআন-হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করাই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২. ১ ক. উত্তম গুণাবলী

ফাযাইল শব্দের অর্থ গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, উত্তম গুণাবলী, প্রশংসনীয় ইত্যাদি। ফাযাইল বহুবচন, একবচন হলো 'ফযল' বা 'ফযীলত'। পরিভাষায় ফাযাইল হলো যেসব উত্তম গুণাবলী, উত্তম স্বভাব, উত্তম আচরণ ও উত্তম কাজ, যা মানুষের সুকুমারবৃত্তির জন্য উপকারী। ইসলামে মানব চরিত্রের যে সব গুণাবলীর কথা উল্লেখ রয়েছে তা উত্তম গুণাবলীর অন্যতম। ইসলামী শিক্ষা তথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহান আদর্শভিত্তিক চরিত্রই হলো 'উত্তম চরিত্র'। সামাজিক জীব হিসেবে মানব চরিত্রের প্রতিটি দিকই চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত 'উত্তম গুণাবলী'র ক্ষেত্র বিস্তৃত। মুহাম্মদ আবূ হামিদ আল-গাযালী (র) (মৃত ৫০৫ হি.) বলেন,

فَإِنْ كَانَتِ الْهَيْئَةُ بِحَيْثُ تَصْدُرُعَنْهَا الأَفْعَالُ الْجَمِيْلَةُ الْمَحْمُوْدَةُ عَقْلاً وَشَرْعًا سُمِّيَتْ تِلْكَ الْهَيْئَةُ خُلُقًا حَسَنًا.

> 'আত্মার মধ্যে প্রোথিত অবস্থা যদি এমন হয় যা থেকে যুক্তি ও শরী'আতের আলোকে সুন্দর ও প্রশংসিত কর্ম উৎসারিত হয় তবে সে অবস্থাকে 'আখলাকে হাসানাহ্' তথা 'উত্তম চরিত্র' বলা হয়।'[১]

ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.) বলেন,

> উত্তম গুণাবলীর অর্থ এই যে, আপনি অপরের সাথে এমন আচরণ করবেন, যাতে মনে হবে আপনি তার বন্ধু এবং নিজের শত্রু। সুতরাং নিজের কাছ থেকে জোরপূর্বক অন্যের অধিকার আদায় করে দিন এবং নিজের জন্য অধিকার আদায়ের দাবী থেকে বিরত থাকুন, তা সে অধিকার যতই ন্যায়সঙ্গত হোক।[২]

Encyclopedia of Islam গ্রন্থে Dr. Mufti M. Mukarram Ahmed বলেন,

> Good Character is the sum of personal virtues which guarantees correct and agreeable behavior in daily social interaction. A person of good character will invariably conform in his behavior to a strich code of ethics.
>
> What should be the underlying principle of this code of ethics? According to a hadith it is simply this: you should like for others what you yourself that is, you should treat others just as you want to be treated by others. Everyone likes to be addressed with good manners and pleasing words.
>
> ‘সুন্দর চরিত্র বলতে প্রাত্যহিক সামাজিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি, ব্যক্তিগত সুন্দর, সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য আচরণকে বুঝায়। একজন সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তি তার আচার-আচরণে দৃঢ় সামাজিক নৈতিকতা বজায় রাখে।’[৩]
>
> এ নৈতিকতার মূলনীতিগুলো কি হতে পারে? একটি হাদীস অনুযায়ী ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যায়, ‘তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যের জন্যেও ঠিক তাই পছন্দ কর।’ এর অর্থ হলো তুমি অন্যদের প্রতি এমন আচরণ প্রকাশ কর যে আচরণ তুমি অন্যদের কাছে আশা কর। প্রতিটি মানুষই অপরের কাছে ভাল আচরণ ও ভাল ব্যবহার আশা করে।’

হাসান আল-বাসরী (র) বলেন, حُسْنُ الْخُلُقِ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَبَذْلُ النَّدَى، وَكَفُّ الأَذَى ‘উত্তম গুণাবলী হলো হাস্যজ্জোল চেহারা, বদান্যতা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া।’[৪] সাহ্‌ল তুসতারীকে ‘উত্তম গুণাবলী’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে সহ্য করা, প্রতিশোধ গ্রহণ হতে বিরত থাকা, অত্যাচারীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও সমতার মনোভব পোষণ করা। মুহাম্মদ আল-গাযালী (র) বলেন, যেহেতু খুলুক বা চরিত্র হলো মানুষের মনের ভিতরের অবস্থা, সুতরাং যেমনিভাবে নাক, কান, গাল, মুখসহ সামগ্রিক সৌন্দর্য ছাড়া কেবল চোখের সৌন্দর্য দ্বারা বাহ্যিক সমন্বয় হবে তখন তা حُسْنُ الْخُلُق বা উত্তম চরিত্রের পর্যায়ে পৌঁছবে। যথা, জ্ঞানশক্তি, ক্রোধশক্তি, প্রবৃত্তিশক্তি ও ন্যায়পরায়ণতা শক্তি। এ চারটি শক্তির যখন উত্তম প্রয়োগ ঘটানোর যোগ্যতা অর্জিত হবে তখনই حُسْنُ الْخُلُق অর্জিত হবে। حُسْنُ الْخُلُق বা ‘উত্তম চরিত্র’ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর ইমাম গাযালী (র) লিখেছেন, তা হলে- উত্তম চরিত্রের চারটি মৌলিক ভিত্তি রয়েছে। যথা- হিক্‌মত, বীরত্ব, পবিত্রতা ও ন্যায়। এ চারটি মৌলিক গুণে ভারসাম্য সৃষ্টি হলে মানুষের মাঝে উত্তম চরিত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্যথায় সে কুটিলতা ও চরিত্রহীনতার শিকার হয়।[৫]

খ. উত্তম চরিত্রের মৌলিক গুণাবলী

সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও শৃংখলা কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে যখন সমাজ হবে সুন্দর ও মনোরম। আর সমাজকে ভালো করতে হলে উত্তম গুণাবলী ও আচার-আচরণ শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য। এ কারণেই সকল ধর্মের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে উত্তম চরিত্রে উপর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إنما بُعِثْتُ لأتمم مكارم الأخلاق ‘সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।’[৬]

চারটি মৌলিক গুণের উপর উত্তম চরিত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ মৌলিক গুণে ভারসাম্য সৃষ্টি হলে মানুষের মাঝে উত্তম চরিত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্যথায় সে কুটিলতা ও চরিত্রহীনতার শিকার হয়। গুণগুলো হলো- ক. জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, খ. বীরত্ব ও সাহসিকতা, গ. ন্যায় ও ইনসাফ, ঘ. পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা।

এছাড়াও অপরের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনা, উদারতা ও দানশীলতা, ধৈর্য ও সহ্য, দয়া ও মমতা, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য, বিনয় ও নম্রতা এবং অন্যের প্রয়োজন মেটানোর মনোবৃত্তি ইত্যাদি গুণে ব্যক্তির গুণান্বিত হওয়ার মাধ্যমেই গঠিত হয় উত্তম চরিত্র।

২. ২ ক. অপরের কল্যাণকামনা করা

অন্যের কল্যাণকামনা করা মু'মিন ব্যক্তির বড়ো গুণ। ইসলাম কল্যাণকামিতাকে দ্বীন হিসেবে উল্লেখ করেছে। সুস্থ-বিবেকসম্পন্ন মানুষমাত্রই সাধারণত নিজের জীবনের যেকোনো বিষয়ে কল্যাণকামী। এটি মন্দ বা নিন্দনীয় কিছু নয় বরং সুন্দর চিন্তাচেতনার পরিচায়ক এবং প্রশংসনীয়। অবশ্য, এটি আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুখকর হয়, যখন কেউ নিজের কল্যাণকামিতার পাশাপাশি অন্যের কল্যাণকামী হয়। নিজের পছন্দের বিষয়কে অন্যের জন্য পছন্দ করে। নিজের অপ্রিয় বস্তুকে অন্যের জন্য অপ্রিয় জ্ঞান করে। নিজের জন্য যা কল্যাণকর ও পছন্দের মনে হবে এবং যা অপছন্দের ও অকল্যাণকর মনে হবে, অন্যের বেলায় ঠিক সেভাবেই মনে করা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ। কল্যাণকামিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে الدِّينُ النَّصِيحَةُ 'দ্বীন হচ্ছে কল্যাণকামিতা।'[৭] ইসলাম সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও কল্যাণকামিতার ধর্ম। মুমিনদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাপকাঠি হচ্ছে- 'কল্যাণকামিতা।' তবে তা হবে সৎকাজে এবং আল্লাহ্‌র ভয়ের ভিত্তিতে। আবার পাপ, সীমালঙ্ঘন ও শত্রুতার কাজে সহযোগিতা করা থেকে বেঁচে থাকাও কল্যাণ কামিতা। কারণ, এসব কাজে সহযোগিতা করা মানে ক্ষতি সাধন করা। কল্যাণকাজে পারস্পরিক সহযোগিতা করা, অকল্যাণ কাজে সহযোগীতা না করার ব্যাপারে ইসলামের দর্শন, লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। তা হচ্ছে- সৎকাজ এবং আল্লাহ্‌র ভয়ের ভিত্তিতে কল্যাণকামিতা। সন্দেহ নেই, নিঃস্বার্থ কল্যাণকামী মানুষরা সুন্দর মন ও মননের অধিকারী। এরা অন্যের কল্যাণ বা উপকার সাধন করতে পারলে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। অপরের মঙ্গল, উন্নতি দেখলে আনন্দিত হন, খুশিতে মেতে ওঠেন। অকৃত্রিম-নির্মল হাসিরেখা তাদের চেহারাকে আরও মায়াবী ও আলোকময় করে তোলে।

অপরদিকে সঙ্কীর্ণমনা লোকেরাই অন্যের অকল্যাণকামী হয়ে থাকেন, ক্ষতিসাধনে নিয়োজিত হন; নোংরা চিন্তাচেতনা লালন করেন। মানুষে মানুষে ঝগড়া-বিবাদ হোক, সমাজে ফেতনা-ফাসাদ লেগে থাকুক এবং বিস্তৃত হোক তাদের নিত্য কামনা। কৃত্রিমভাবে সাধু সাজা আর মিষ্টি কথার বুলি আওড়ানো তাদের পেশা। অনাচার-স্বার্থান্বেষণ তাদের নেশা। কারো ভালো কিছু তাদের সহ্য হয় না, বরং তারা মনে মনে ভীষণ পীড়ায় ভোগেন। এটি প্রমাণ করে, তাদের মলিন বীভৎস চেহারা, যা কোনোভাবেই ঢেকে রাখা যায় না। বলাবাহুল্য, নিজের মঙ্গল-উন্নতি কামনার মতোই কিছু মানুষের স্বভাবজাত গুণ হচ্ছে, অন্যের ক্ষতিসাধন বা উন্নতি সইতে না পারা, ছিদ্রান্বেষণ, পরচর্চা, মিথ্যাচার, অমঙ্গল কামনা, লিপ্সা ইত্যাদি। এগুলো চরম ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য। এগুলো কোনো সৎ ও সুন্দর মনের মানুষের গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়। ইসলাম এগুলোকে প্রকৃত মুমিন হওয়ার প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত করেছে। আমাদের উচিত, অন্যের উন্নতিতে তার সহযোগী হওয়া, প্রতিহিংসা পরায়ণ না হওয়া। অপরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, অন্যের দুঃখ দেখে উল্লসিত না হওয়া।

খ. কুরআন ও হাদীসের আলোকে কল্যাণকামনা করার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সাধারণত মুসলমানদের জন্য নসীহত ও কল্যাণকামিতার অর্থ, তাদের কল্যাণার্থে সঠিক পথের নির্দেশনা দেওয়া। দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে তা'লিম দেওয়া। তাদের দোষক্রটি গোপন রাখা, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা। তাদের সঙ্গে খেয়ানত ও প্রতারণা না করা। হিংসা থেকে দূরে থাকা। তাদের জন্য কষ্ট সহ্য করা। নবী-রাসূলের তরীকায় তাদের নসীহাহ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 'তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।'[৮]

হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদের সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না।'[৯]

হযরত হুদ (আ) সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী, বিশ্বস্ত।'[১০]

হযরত সালেহ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ 'সালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা মঙ্গলকামীদের ভালোবাস না।'[১১]

কল্যাণকামিতা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইয়াসিন (আ)-এর প্রতি ঈমান প্রদর্শনকারী সম্পর্কে বলেছেন, اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ 'রাসূলদের অনুসরণ করো। অনুসরণ করো তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথপ্রাপ্ত।'[১২]

ঘটনার সমাপ্তিতে বলেছেন, قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ 'তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলল হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোনোক্রমে জানতে পারত!"[১৩] এ আয়াত প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, 'স্বজাতির জন্য নাসীহা ও কল্যাণকামিতা বেঁচে থাকাকালীন এবং মৃত্যুর পরেও।'

মুসলিমদের প্রতি পারস্পরিক সুসম্পর্ক রাখা, তাদের কল্যাণকামনা করা এবং কেউ বিবাদে জড়িয়ে পড়লে মীমাংসা করে দেওয়া যেমন আল্লাহ্‌র নির্দেশ তেমনি সুন্নাতও। একে অপরের কল্যাণের একাজে অংশগ্রহণ করলেই আল্লাহ্ রহমত অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি এভাবে ঘোষণা করে, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُوْنَ ‘নিশ্চয়ই মু’মিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই; কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।’[১৪]

আয়াতটি দুনিয়ার সব মুসলিমকে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দুনিয়ার অন্য কোনো আদর্শ, মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে মুসলমানদের মতো এমন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পাওয়া যায় না। এটাও এ আয়াতের বরকতে সাধিত হয়েছে।

প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণকামনা করা নবী করীম (সা)-এর সুন্নাত। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- জারির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ‘রাসুলুল্লাহ (সা) আমার থেকে তিনটি বিষয়ে বায়‘আত নিয়েছেন। তাহলো- ১. সালাত প্রতিষ্ঠা করার। ২. যাকাত আদায় করা এবং ৩. প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণকামনা করার।’[১৫]

গীবত এমন এক সামাজিক ব্যাধি। যার ক্ষতি ও পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ ও মারাত্মক। গীবতকারীর পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেন, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ ‘আর তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে চাবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই মনে কর।’[১৬]

এক মুসলমান অন্য মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ নয়, গীবত করবে না বরং পরস্পর একে অপরের কল্যাণকামনা করবে। ঝগড়া-বিবাদ থাকলে তা মিটিয়ে দেবে। মুসলমানের কল্যাণকামনা করা প্রসঙ্গে হাদীসের একাধিক নির্দেশনায় তা ফুটে ওঠেছে-

১. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস‘ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ‘মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং হত্যা করা কুফরী।’[১৭]

২. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসে অপরের ছিদ্রান্বেষণ বা গোপন দোষ-ক্রুটি বিচ্যুতি খুঁজতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি একটি অনৈতিক কাজ। এর দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলা বন্ধন বিনষ্ট হয় এবং বিভিন্ন রকম ফিতনা ফাসাদের সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ

‘হে সেই লোক! যে মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছ অথচ ঈমান তার অন্তরে প্রবিষ্ট হয়নি। তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিওনা এবং তাদের নিন্দা করো না। তাদের সুপ্ত বিষয় অবগত হওয়ার জন্য তৎপর হয়ো না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাই-এর সুপ্ত বিষয় জানার জন্য তৎপর হয় আল্লাহ্ তার সুপ্ত বিষয় ফাঁস করার জন্য তৎপর হবেন। তাকে তিনি অপদস্থ করবেন, যদিও সে উষ্ট্রের হাওদার মধ্যে অবস্থান করে।’[১৮]

৩. আবূ দারদা নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘যে ব্যক্তি তার কোনো (মুসলিম) ভাইয়ের সম্মান তার অসাক্ষাতে রক্ষা (কল্যাণকামনা) করে, কিয়ামতের দিন তার সম্মান রক্ষা (কল্যাণকামনা) করা আল্লাহ্‌র জন্য কর্তব্য হয়ে পড়বে।’[১৯]

৪. মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য হযরত মুহাম্মাদ (সা) ঘোষণা দিয়ে বলেন,

اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسَلِّمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ.

‘এক মুসলমান অপর মসুলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুল্‌ম করে না, তাকে শত্রুর হাতে তুলে দেয় না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকে আল্লাহ্ তার চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকেন।’[২০]

৫. দেশের ব্যবধান ডিঙ্গিয়ে, জাতির ভেদাভেদ ভুলে বিশ্বের সকল মুসলিমরা একই জাতি। মুসলমানদের পরস্পর পরস্পরের জান-মাল, ইয্‌যাত সংরক্ষণ, সৌহার্দ আচরণ, সহমর্মিতা প্রদর্শন ও কল্যাণকামনা করার প্রতি তাকিদ দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟» قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ» : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

‘একদা রাসুলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কেরামের একদলের সঙ্গে বসা অবস্থায় বললেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম

ব্যক্তি কে, আমি কি তা তোমাদের বলব? সাহাবায়ে কেরাম নীরব থাকলেন। রাসুলুল্লাহ (সা) এ কথা তিনবার বললেন। অতঃপর জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহ্‌র রাসুল! রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো, যার থেকে সবাই কল্যাণের আশা করে এবং তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হলো, যার থেকে কল্যাণের আশা করা যায় না এবং তার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদ নয়। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।'[২১]

মনে রাখতে হবে কুরআনের নির্দেশনা ও হাদীসের গুরুত্বারোপ থেকেই প্রমাণিত যে, মুসলিম উম্মাহ এক দেহ এক প্রাণ। যারা পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও কল্যাণকামনা করবে তারাই মুক্তি পাবে। তাদের কোনো সমস্যায় পরস্পর এগিয়ে গেলেই মিলবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত তথা অনুগ্রহ। মুমিনরা যখন পরস্পর ভাই ভাই, তখন তাদের সবার মূল বস্তু হলো ঈমান। অতএব ঈমানের দাবি হলো- একই ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা যেন ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ না করে। বরং পরস্পর মিল-মহব্বতের সঙ্গে পরস্পরের কল্যাণকামনা করে। এক সঙ্গে সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সুখে-দুঃখে একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে চলা। পরস্পরকে ভালোবাসে এবং একে অপরের হিতাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামী হয়। কখনও ভুল বুঝাবুঝির মুখোমুখি হবে না। কেউ ভুল বুঝাবুঝির মুখোমুখি হলে একে অপরের মধ্যে সমঝোতা বা মীমাংসা করে দেবে। আর তাতেই নাজিল হবে রহমত তথা অনুগ্রহ।

২. ৩ ক. আত্মত্যাগ

আত্মত্যাগ মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি আর ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা বান্দা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করে। এ জন্য ইসলাম অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। আত্মত্যাগ মানুষকে অনন্য উঁচু আসনে আসীন করে। আত্মত্যাগের অর্থ, নিজের অন্তরে এই মানসিকতা তৈরি করা যে আমি আমার আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে অন্যকে খুশি করব। আমি নিজে শত কষ্ট মুখ চেপে সহ্য করব, তবু অন্যকে কষ্ট দেব না। কোনো ভাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করব না।

মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় যে কজন ঈমানদার ব্যক্তি ছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সুহাইব (রা)। সীমাহীন অত্যাচার ও অনাচার করা হয়েছে তার উপর। তিনি অসম্ভব ধৈর্য এবং দৃঢ়তা নিয়ে এসব সহ্য করেছেন। সুহাইব (রা)-এর উপর অমানুষিক নিপীড়ন মুহাম্মদ (সা)-কেও শোকাভিভূত করে তুলল। তিনি সুহাইবের উপর কাফেরদের এ নির্যাতন সহ্য করতে পারলেন না। তাই নবী করীম (সা) একদা সুহাইবকে ডাকলেন। নবী করীম (সা) তাকে মক্কা থেকে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্‌র নবীর নির্দেশ সুহাইব মেনে নিলেন। নিজ দেশের মায়া-মমতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসা ছেড়ে সুহাইব (রা) একদা হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। যাবার সময় সুহাইব (রা) পরিধানের পোশাক ও আত্মরক্ষার জন্য সামান্য অস্ত্র সাথে নিলেন। সুহাইব দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন একথা কুরাইশদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা সুহাইবকে ধরার জন্য লোক পাঠাল। যে করেই হোক সুহাইবকে ধরে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হলো। খুঁজতে খুঁজতে একসময় সুহাইবের সন্ধান পেয়ে গেল কুরাইশরা। সুহাইব (রা) এতে মোটেও বিচলিত হলেন না। তিনি কুরাইশদের এ বাড়াবাড়ি রুখে দাঁড়ালেন। সুহাইব (রা) শত্রুদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের অবশ্যই জানা আছে যে, আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। আমার হাতে একটিও তীর থাকা পর্যন্ত কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তীর যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে তরবারি ব্যবহার করব। তরবারি ভেংগে গেলে তোমরা আমার যা খুশি তাই করতে পারবে। এর চেয়ে বরং তোমরা আপোষে আসো। মক্কায় আমার যা কিছু আছে তা তোমরা নিয়ে নাও, আর আমাকে ছেড়ে দাও। কুরাইশরা ঘাবড়ে গেল। তারা কোনো ঝুঁকি না নিয়ে সুহাইবকে ছেড়ে দিল। তারা ভাবল ধন-সম্পদ যেহেতু পাওয়া গেছে, তাহলে সুহাইবকে বরং এদেশ থেকে চলে যেতে দেয়াই ভালো। মাতৃভূমির মায়া ছেড়ে তিনি মদীনায় রওয়ানা হলেন। হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন সুহাইবের সাক্ষাৎ পেলেন। সাক্ষাতে রাসূলুল্লাহ (সা) সুহাইবের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা প্রদর্শন করলেন। নবী করীম (স) সুহাইবকে বললেন, 'বড়োই লাভের ব্যবসা করলে সুহাইব।' নবী (সা) সত্যিই বলেছেন। সুহাইব (রা) অধিক মর্যাদার দাবীদার ছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ ও সহনশীলতা তাঁকে উচ্চ মর্যাদার আসনে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় স্থানেই মর্যাদা ভূষিত হলেন।

খ. সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আত্মত্যাগের শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আত্মত্যাগের যে শিক্ষা দিয়েছেন তা আমরা বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে দেখতে পাই। সাহাবাদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেন, أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 'এবং (সাহাবারা) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়।'[২২]

অপর মুসলমান ভাইকে খুশি করার জন্য আত্মত্যাগ করা আল্লাহ্‌র নিকট এক বিশেষ নিয়ামত। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা এই নিয়ামত দান করেছেন শুধু তিনিই এর প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন। এই আনন্দ ও স্বাদ অনুভব করার কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রা) এত আত্মত্যাগ করতে পেরেছেন। যার বর্ণনা সাহাবীদের জীবনীতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে হাদীসের মাধ্যমে আত্মত্যাগের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো-

এক. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি খুব ক্ষুধার্ত। তখন তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের নিকটে পাঠালেন; কিন্তু তিনি তাদের কাছে কিছুই পেলেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এমন কেউ আছে কি, যে আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমানদারি করতে পারে? আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত করবেন। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা), এরপর তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং নিজ স্ত্রীকে বলেন, ইনি রাসূল (সা)-এর মেহমান। কোনো জিনিস জমা করে রাখবে না। স্ত্রী বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে ছেলে-মেয়েদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি বললেন, ছেলেমেয়েরা রাতের খাবার চাইলে তুমি তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়ো, (খাবার নিয়ে) আমার কাছে চলে এসো, আর বাতিটি নিভিয়ে দিয়ো। আজ রাতে আমরা ভুখা থাকব। স্ত্রী তাঁর কথামতো তাই করল। পরদিন সকালে আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, 'অমুক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন অথবা অমুক অমুকের কাজে আল্লাহ্ হেসেছেন।' এরপর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন, 'এবং তাঁরা তাদের নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও।'[২৩]

এই হাদীসটি থেকে আমাদের জন্য কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যথা-

ক. নবী করীম (সা) ঐ ব্যক্তিকে প্রথমে নিজে মেহমানদারি করাতে চেয়েছেন। শুরুতেই তাকে অন্যের কাছে পাঠাতে চাননি। অতএব, মেহমানদের আপ্যায়ন নিজের থেকেই শুরু করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা গ্রহণের বাস্তব শিক্ষা নিহিত রয়েছে এ ঘটনায়।

খ. এই ঘটনাটিতে পরিবার পরিজনসহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কষ্ট এবং মুজাহাদার যিন্দেগীর একটি বাস্তব নমূনা ফুটে উঠেছে। আখিরাতের অনন্তহীন সময়ের তুলনায় অতি সামান্য এই পার্থিব হায়াতে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, বিলাসবহুল এবং আরামপ্রিয় জীবনে যে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না এবং এগুলো যে তিনি পছন্দও করতেন না, সে শিক্ষা রয়েছে আমাদের জন্য।

গ. নিজের গৃহের অবস্থা সাহাবী আবূ তালহা (রা)-এর অজানা থাকার কথা নয়। এরপরও তিনি ক্ষুধার্তকে খাওয়ানোর মতো সাওয়াবের কাজটি হাতছাড়া করতে চাননি। অতএব, গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে উক্ত হাদীস থেকে আরো বহুসংখ্যক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

দুই. মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর নবী করীম (সা) মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। সুন্দর শৃংখলার জন্য কার সাথে মুহাজির ও আনসারগণ বসবাস করবেন সেটাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন আনসারী সাহাবী সা'দ ইব্‌ন রবীর সাথে। তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফকে ঘরে নিয়ে গেলেন। এরপর তাকে সম্বোধন করে বললেন,

أَيْ أَخِي، أَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا، فَانْظُرْ شَطْرَ مَالِي، فَخُذْهُ، وَتَحْتِي امْرَأَتَانِ، فَانْظُرْ أَيُّهُمَا أَعْجَبُ إِلَيْكَ حَتَّى أُطَلِّقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلُّوهُ عَلَى السُّوقِ، فَذَهَبَ فَاشْتَرَى وَبَاعَ وَرَبِحَ، فَجَاءَ بِشَيْءٍ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ.

'ভাই আবদুর রহমান! আজ থেকে আমার অর্ধেক সম্পদের মালিক তুমি। আর শোনো, আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে। তোমার যাকে পছন্দ হয় বল, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত শেষ হলে তুমি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) জবাবে বললেন, ভাই সা'দ! আল্লাহ্ তোমার সম্পদ ও পরিবারে বরকত দান করুন। তোমার সবকিছু তোমার কাছেই থাক। আমাকে শুধু বাজারের রাস্তাটা দেখিয়ে দাও।' আমি ব্যবসা করতে চাই। সা'দ ইব্‌ন রবী (রা) তাকে বনু কায়নুকার বাজার দেখিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে বেচা-কেনা শুরু করলেন। প্রথম দিনই কিছু টাকা লাভ হলো। তা দিয়ে তিনি খাওয়ার জন্য কিছু ঘি ও মাখন কিনে আনলেন। এভাবে তার ব্যবসায় দিন দিন উন্নতি হতে লাগল। নিজ হাতের উপার্জনের মাধ্যমেই তিনি আস্তে আস্তে সচ্ছল হয়ে উঠলেন। এরপর এক আনসারী নারীর সাথে তার বিবাহ হলো।'[২৪]

উপর্যুক্ত ঘটনায় আলোকিত দুজন মানুষের দুটি বিষয় প্রতিভাত হয়ে ওঠে। যেমন-

প্রথমত: আনসারী সাহাবী সা'দ ইব্‌ন রবী (রা)-এর আপন মুসলিম ভাইয়ের জন্য বিরাট আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ কুরবানী পেশ করার বিষয়টি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত: মুহাজির সাহাবী আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তার আনসারী ভাইয়ের সম্পদ ও ব্যক্তিগত বিষয়ে দখল করেননি। বরং তিনি সহানুভূতি দেখানোর কারণে তার প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন।

এগুলো কেবল মাত্র বিচ্ছিন্ন এক বা দুটি ঘটনা নয়; বরং মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের সাধারণ কর্মপন্থা এরকমই ছিল। হ্যাঁ, কেউ কেউ তার কর্মসংস্থান তৈরি বা জীবন-যাপনের নিজস্ব একটা ব্যবস্থা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আনসারী ভাইয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছেন ঠিক তবে তা ছিল ক্ষণকালের জন্য। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তারা নিজেরাই কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। তাদের মুসলিম ভাইদের উপর বোঝা হয়ে থাকেননি।

তিন. মুসলিম ভাইদের জন্য আনসার সাহাবীগণের স্বার্থত্যাগ এবং মুহাজিরদের পক্ষ থেকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়টি যে ব্যাপক ও সাধারণ ব্যাপার ছিল তা বোঝার জন্য আরো এক-দুটি বর্ণনা লক্ষ করুন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ: «لاَ»، فَقَالَ: «تَكْفُونَا المؤُونَةَ وَنُشْرِكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ»، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

'আনসার সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-কে বললেন, "আমাদের খেজুর বাগানগুলো মুহাজির ভাই ও আমাদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দিন। নবী করীম (সা) তাদের এ প্রস্তাব নাকোচ করে দিয়ে বললেন 'না'। আনসারগণ মুহাজিরগণকে বললেন, তোমরা শুধু আমাদেরকে চাষাবাদের কাজে সাহায্য করবে, আর আমরা তোমাদেরকে ফসলের ভাগ দিব। অবশেষে তারা সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন।'[২৫]

এই হাদীসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আনসারদের পছন্দনীয় তিনটি বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে, তা হলো-

ক. নিজেদের উপর মুহাজিরদের প্রাধান্য দেয়া।

খ. মুহাজিরদের প্রতি সর্বদা সমবেদনা প্রকাশ করা।

গ. নিজেদের জন্য দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের প্রতিদানকেই প্রাধান্য দেয়া।[২৬]

পরিশেষে বলা যায় যে, আত্মত্যাগের একটা অনন্য দিক আছে। মানসিক প্রশান্তির দিক। দুনিয়াতে আমি শুধু আমার জন্য বাঁচি না, এটা মানুষের মনে একটা শ্রদ্ধাবোধ জন্ম দেয়। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা। যারা যত বেশি আত্মত্যাগ করে তাদের মনে হয় কিছুই করতে পারিনি। এরা মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য কাজ করে না, আল্লাহ্‌কে খুশি করার জন্য আত্মত্যাগ করে। আল্লাহ্ তা'আলাও এর বিনিময়ে কার্পণ্য করেন না। তিনি ঘোষণা করেছেন,

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

'আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যাই খরচ করি না কেন আল্লাহ্ তার উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।'[২৭]

আজ আমাদের ভেতরে কোথায় সাহাবায়ে কেরামের আলোকিত জীবনের উন্নত সেসব আদর্শ? আফসোস! আমরা শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। আমার আমার করে করে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ। সবকিছু গিলে খাওয়ার পরেও আমাদের অন্তহীন ক্ষুধা মেটে না। আমাদের চাহিদা শেষ হয় না। আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হয় না। আমাদের চাওয়া পাওয়া শেষ হয় না। আমাদের পেট ভরলেও চোখ ভরে না। পরের জন্য ভাবি না। অন্যের অধিকার নিয়ে চিন্তা করি না। হায় হায়! আমরাও যদি সাহাবায়ে কেরামের মত আত্মত্যাগের নাজরানা আমাদের জীবনের পরতে পরতে পেশ করতে পারতাম! আমরাও যদি অপরের প্রয়োজনকে নিজেদের প্রয়োজনের উপরে স্থান দিতে পারতাম! আমরাও যদি অপরের অধিকার আর মর্যাদাকে সমুন্নত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারতাম! আমাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস, যে সুমহান আদর্শের পরশ পাথরের সান্নিধ্য-ছোঁয়ায় ইসলামের প্রাথমিক যুগগুলোর উত্তম মানুষেরা একদা আলোকিত করেছিলেন গোটা বিশ্বকে, আজকের যুদ্ধ বিধ্বস্ত, ক্ষুধা পীড়িত অশান্ত পৃথিবীর কানায় কানায় আবার জান্নাতের সুবাতাস বইয়ে দেয়া সম্ভব একমাত্র সে মহান আদর্শের পুনর্বাস্তবায়নের মাধ্যমেই। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আত্মত্যাগের সেসব মহান আদর্শ নিজেদের জীবনে ধারণ, অন্যদের সামনে উপস্থাপন এবং বিশ্বময় বাস্তবায়ন করার তাওফিক প্রদান করুন।

২. ৪. দয়া-মায়া ও ভালোবাসা

সমাজের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক দয়া-মায়া, ভালোবাসা, সৌহার্দ ও সৌজন্য সুস্থ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য বিষয়। সব সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া ও ভালোবাসা বিদ্যমান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।'[২৮] অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي 'আমার

দয়া প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে।'[২৯] দয়া ও ভালোবাসার মধ্যেই ফুটে ওঠে উত্তম চরিত্র। এটি একটি মহৎ গুণ ও ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য। কেননা, প্রকৃত মুমিন তো সেই, যে দয়াময়, পরোপকারী ও কল্যাণকামী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ 'সম্প্রীতি ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে মুমিনের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মতো।'[৩০]

কেউ ভুল করে ফেললে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং দুঃখী মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। নবী করীম (সা) বলেন, ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يَغْفِرِ اللهُ لَكُمْ 'অপরের প্রতি দয়া করো, তাহলে তোমাকেও দয়া করা হবে এবং ক্ষমা করুন তাহলে আল্লাহ্ তোমাকেও ক্ষমা করবেন।'[৩১] অন্য এক হাদীসে নবী করীম বলেন, مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ 'যে ব্যক্তি কারো প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করেন না।'[৩২] আপর হাদীসে নবী করীম (সা) বলেছেন,

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

> 'রহমকারীদের প্রতি রহমান আল্লাহ্ করুণা ও রহম করে থাকেন। সুতরাং যমিনের বাসিন্দাদের প্রতি দয়ামায়া করো, আসমান ওয়ালা তোমাদের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবেন।'[৩৩]

এই হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি এমনকি পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রতিটি জীবের প্রতি ইসলাম সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা বলে (যদি তার প্রতি করুণা সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হয়)। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন,

> بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.
>
> 'এক ব্যক্তি প্রচণ্ড পিপাসার্ত অবস্থায় একটি কুয়া পেলো। সে কুয়াতে নেমে পানি পান করলো। বের হয়েই দেখতে পেলো, একটি কুকুর পানি না পেয়ে প্রচণ্ড পিপাসায় ভিজা মাটি চাটছে। সে ভাবলো, আমার মতো কুকুরটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছে। লোকটি দয়াপরবশ হয়ে আবার কুয়ায় নামলো এবং নিজের চামড়ার মুজায় পানি ভরে এনে কুকুরটিকে খাওয়ালো। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে করে দিলেন।'[৩৪]

বড়ো আক্ষেপের বিষয়, আজ আমাদের মাঝ থেকে দয়া-মায়া, ভালোবাসা ও সমবেদনার গুণ উঠে গেছে। ফলে আমরাও আল্লাহ্ তা'আলার রহমত লাভের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছি।

আল্লাহ্র ভালোবাসার মর্যাদা আলাদা। তার ভালোবাসায় প্রতিদানের কোনো প্রত্যাশা থাকে না। তিনি শুধু দিতেই থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 'যদি তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা করো, তা শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৩৫] অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ 'আপনি আল্লাহ্র রহমতের চিহ্নগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিন।'[৩৬]

যে বান্দা আল্লাহ্কে ভালোবাসেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করেন এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করতে চান, এ জন্য নেক আমল করা প্রয়োজন। এটির মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালোবাসার বিশেষ স্তরে স্থান পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 'তোমরা সৎকাজ করো, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালোবাসেন।'[৩৭] অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালোবাসেন।'[৩৮] وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।'[৩৯] রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকি, অমুখাপেক্ষী ও গোপনে ইবাদতকারীকে ভালোবাসেন।'[৪০] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لاَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখায় না, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করেন না।'[৪১]

রাসূলুল্লাহ (সা) শুধু মানুষের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেননি বরং তিনি জীব-জন্তু, পশু-পাখির সাথেও দয়াপূর্ণ আচরণ ও নম্র ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এসব প্রাণীও আল্লাহ্র সৃষ্টি।

২. ৫. ক. আত্মীয়তার সম্পর্ক

আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামী সামাজিক সংস্কৃতির অন্যতম একটি দিক। ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামী জীবন বিধানে আত্মীয়তার হক আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা

বলেন, وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ 'আত্মীয়দের হক আদায় কর।'[৪২] আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। আত্মীয়তা ছিন্ন করা মুসলিম সমাজের জন্য চরম ক্ষতিকর।[৪৩] আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوَقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارِ.

> 'কোনো মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা জায়েয নয়। কেউ যদি তিন দিনের বেশি ছিন্ন অবস্থায় মারা যায় তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[৪৪]

আলোচ্য হাদীসে ভাই বলতে এখানে সহোদর, বৈমাত্রিয়, বৈপিত্রেয় এবং মুসলিম ভাই সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

আত্মীয়তার আরবী আস্-সিলাহ্ (اَلصِّلَةُ)। শাব্দিক অর্থ অনুদান, পুরস্কার, পরোপকার করা। বৈষয়িক ও অভ্যন্তরীণভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৪৫] সা'দী আবূ জাইয়্যেব বলেন,

صلة الرحم: هي الاحسان إلى الاقارب على حسب حال الواصل والموصول.

'সিলাতুল-রিহ্ম হচ্ছে সম্পৃক্ততার দিক থেকে আত্মীয়দের মাঝে দয়া করা।'[৪৬]

ইমাম মহীউদ্দীন আন্-নববী (র) বলেন,

> 'সিলাতুল-রিহ্ম বলতে ব্যক্তি ভেদে নিকট আত্মীয়দের সাথে সদাচারণ করাকে বুঝায়। তা কখনো অর্থ দিয়ে, কখনো খিদমতের মাধ্যমে, কখনো সাক্ষাতের ও সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে।'[৪৭]

খ. আত্মীয়তার সম্পর্কের হুক্ম ও স্তর

একজন মুসলিম নিকটাত্মীয়দের প্রতি যেসব শিষ্টাচার বজায় রাখবে যা পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোনদের সাথে বজায় রাখে। যেমন খালার সাথে মায়ের মতই আচরণ করবে, চাচার সাথে পিতার সমতুল্য আচরণ করবে। আত্মীয়-স্বজনদের বড়োদের ন্যায় সম্মান করবে, ছোটদের স্নেহ করবে, অসুস্থ হলে সেবা যত্ন করবে। দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত হলে বা বিপদে পড়লে উদ্ধার করবে। মুসিবতে শান্তনা দিবে। তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবে যদিও তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদের সাথে কোমল আচরণ করবে যদিও তারা কঠোর আচরণ করে বা যুল্ম করে।[৪৮] কাযী আয়ায (র) বলেন,

> 'সকলের একমতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কবিরা গুনাহ্ যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যার সর্বনিম্ন স্তর হলো সালাম বিনিময় ও পরস্পর কথা বলা বন্ধ না করা। এর বিধান গুলো অবস্থা, প্রয়োজন ও সামর্থভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন, কোনোটি ওয়াজিব, কোনোটি মুস্তাহাব। সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে সামর্থের শেষ সীমা পর্যন্ত না পৌঁছলেও কোনো রকম সম্পর্ক বজায় রাখাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বলা যায় না। তেমনিভাবে ইচ্ছা করে ত্রুটি করলে তাতেও সম্পর্ক বজায়কারী বলা হয় না।'[৪৯]

গ. আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রকারভেদ

আত্মীয়তার সম্পর্ক দু'প্রকার। ক. عَامٌ বা সাধারণ, খ. خَاصٌ বা বিশেষ বা অসাধারণ।

ক. সাধারণ অর্থাৎ দ্বীনের সম্পর্ক

ঈমানের দিক দিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ওয়াজিব। ঈমানদারকে ভালোবাসা, তাদেরকে সাহায্য করা এবং সুন্দর উপদেশ দেওয়া। তাদের ক্ষতি না করা। তাদের মাঝে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করা ও তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা এবং তাদের ওয়াজিব হক আদায় করা। যেমন, অসুস্থদের সেবা শুশ্রুষা করা। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ানো, জানাযার নামায আদায় করা ও কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা।

খ. বিশেষ বা অসাধারণ

পিতা-মাতার সম্পর্কের আত্মীয়তা বজায় রাখা। পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের হক আদায় করা ওয়াজিব। তাদের খোর পোষের ব্যবস্থা করা, তাদের অবস্থার খোঁজ খবর নেয়া, তাদের প্রয়োজনীয় সময়ে উদাসীন না হওয়া।[৫০]

ঘ. আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা

আত্মীয়দের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তাদের সম্মান করা, উৎসাহ দান এবং সুখ-দুঃখের সংবাদ নেয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বহু সংখ্যক বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ 'আর পিতা-মাতার এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ করবে।'[৫১]

সালমান ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى' الْمِسْكِيْنِ صَدَقَة، وَعَلَى' ذِيْ الرَّحِمِ اِثْنَتَان: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

'মিসকীনকে দান করা একটি সাদাকার সমতুল্য। আর আত্মীয়কে দান করা দুটি নেকি। একটি সাদাকার অপরটি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে।'[৫২]

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা একথা নির্দ্বিধায় বুঝা যায় যে, অভাবগ্রস্থ আত্মীয়-স্বজনকে দান করাই ব্যক্তির সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য। অভাবগ্রস্থ আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে দূরবর্তী লোকদেরকে দান করা আল্লাহ্‌র নিকট কিছু মাত্র পছন্দনীয় নয়। কেননা তাতে 'রেহ্‌ম' কর্তন তথা ছিন্ন করা হয়।

আত্মীয়তা রক্ষা করা মু'মিনগণের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই আত্মীয়-স্বজনরা সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। শুধু তারা সম্পর্ক রক্ষা করলে নিজেও সম্পর্ক রক্ষা করা এতটুকুতেই যথেষ্ট নয়, সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এটাই ঔদার্য ও মহত্ব, মু'মিনকে এই উদারতা ও মহত্বের পরিচয় দিতে হবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلٰكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. 'প্রতিদানদাতা প্রকৃত অর্থে আত্মীয়তা রক্ষাকারী বা আত্মীয়তার হক্ আদায়কারী নয়; বরং প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী হচ্ছে সে, যে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পরও সম্পর্ক রক্ষা করে।'[৫৩]

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিযিক বৃদ্ধি হোক; এবং হায়াত বাড়িয়ে দেয়া হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।'[৫৪]

জুবায়র ইব্‌ন মুত'ঈম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ 'আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৫৫] আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না-একথার অর্থ হলো, নেক্‌কার লোকেরা কিয়ামতের দিন প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর আত্মীয়তা ছিন্নকারী ব্যক্তি প্রথমে অবশ্য জান্নাতে যেতে পারবে না, নিজের পাপের শাস্তিভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২. ৬ ক. ক্ষমা ও উদারতা

ক্ষমা ও উদারতা ইসলামী সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে চলতে হলে নিজের এবং অপরের ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা পেতে হলে অপরকেও ক্ষমা করতে হবে। এ কারণে অবশ্যই মু'মিনকে ক্ষমাশীল গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ। ক্ষমা করা নিঃসন্দেহে উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম। ক্ষমা করা দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তিত্বের চিহ্ন। ক্ষমা ব্যতীত এ জগতে সংসার অচল হতে বাধ্য। মনিব তার চাকরকে, মালিক তার শ্রমিককে, কর্তা ব্যক্তি তার অধীনস্থদেরকে ক্ষমা করতে হবে। এমনকি পশু-পাখি, জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করাই মহত্ত্বের গুণ।

ক্ষমার আরবী হলো اَلْعَفْوُ 'আল-আউফ্‌ভু'। আভিধানিক অর্থ, الإِسْقَاطُ، اَلتَّجَاوُزُ، تَرْكُ الْعِقَابِ 'মিটিয়ে দেয়া, অতিক্রম করা, শাস্তিকে পরিত্যাগ করা।'[৫৬] পরিভাষায় ক্ষমা হলো প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দেওয়া। মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্‌সান বলেন, هُوَ الصَّفْحُ الإِعْرَاضُ عَنِ الْعُقُوْبَةِ 'শাস্তি থেকে উদ্ধার পাওয়াকে ক্ষমা বলা হয়।'[৫৭] ড. হামিদ সাদিক ও ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস বলেন, اَلتَّجَاوُزُ عِنَ الذَّنْبِ، اَلْعَفْوُ عَنِ الذَّنْبِ: مَحْوُهُ 'পাপকে অতিক্রম করা, পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া ক্ষমা অর্থাৎ পাপকে মুছে ফেলা।'[৫৮] Thomas Patrick Hughes বলেন,

'AFU **(عَفْو):** Lit. "erasing, cancelling." The word is generally used in Muhammadan books for pardon and forgiveness."[৫৯]

'আফ'উ অর্থ হচ্ছে মুছে দেয়া, বাতিল করা। শব্দটি সাধারণত মুহাম্মাদ (সা)-এর অনুসারীদের মতে ক্ষমা এবং মাফ করে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।'

আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল। মহান আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রতাপশালী। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সকল অবাধ্য গুনাহগার বান্দাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। তাঁর কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। এতদসত্ত্বেও বহু সংখ্যক মানুষ তাঁকে এবং তার দেওয়া জীবন বিধানকে কেবল অস্বীকার করে না, বরং তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করে এবং শিরকের ন্যায় জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। অথচ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এগুলো অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬০] যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ 'হে নবী! আপনি তাদের উত্তমভাবে ক্ষমা করে দিন।'[৬১]

আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাকে নবী-রাসূলগণের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ 'অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।'[৬২]

প্রতিটি মানুষের ক্ষমা ও উদারতার গুণে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'আর তোমরা যদি তাদের ক্ষমা কর, তাদের দোষক্রটি উপক্ষো কর, এবং ক্ষমা কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৬৩]

আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্য ধারণকারী ও ক্ষমাকারী সম্পর্কে বলেন, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 'যে লোক ধৈর্য ধারণ করবে ও ক্ষমা করবে, নিঃসন্দেহে এটা বড়ো উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।'[৬৪] অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ 'অতএব, আপনি (হে নবী) তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'[৬৫]

অন্যায়কারীর অপরাধ ক্ষমা করা তাক্ওয়া লাভের উপায় এবং ক্ষমা করা তাক্ওয়ার নিকটবর্তী গুণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 'আর ক্ষমা করে দেওয়াই তাক্ওয়ার নিকটতর।'[৬৬] রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হযরত মূসা (আ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন হে আল্লাহ্! আপনার বান্দাদের মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী কে? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, "যে ব্যক্তি (প্রতিশোধ নেওয়ার) শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ 'ক্ষমার পথ বা নীতি অবলম্বন করবেন, সৎ কাজের নির্দেশ দিবেন এবং অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চলবেন।'[৬৭] এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সা) প্রশ্ন করেন, হে জিবরাঈল (আ)! এর অর্থ কী? জিবরাঈল (আ) বললেন, 'আমার জানা নেই। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে আমি জেনে নিব। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা থেকে জেনে নিয়ে জিবরাঈল (আ) বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (সা)! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আপনি তার সাথে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখুন। যে আপনাকে বঞ্চিত করে আপনি তাকে দান করবেন এবং যে আপনার প্রতি অবিচার-অত্যাচার করে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।'[৬৮]

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে উরওয়া সূত্রে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত আছে, 'আয়াতটিতে মানুষের ব্যবহারগত ক্রটির ক্ষেত্রে ক্ষমার পথ অনুসরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' সা'ঈদ ইব্ন মানসূর (র) বর্ণনা করেন, خُذِ الْعَفْوَ অর্থাৎ মানুষের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ক্ষমার পথ অনুসরণ কর। আল্লাহ্ মানুষকে রাসূল (সা)-এর ক্ষমাশীল বিনম্র সংস্রব দ্বারা পথে আনতে চান।[৬৯]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ 'সাদাকা করাতে সম্পদের ঘাটতি হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।'[৭০]

প্রতিটি মানুষের জন্য ক্ষমার গুণে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'তোমরা যদি ওদের ক্ষমা কর, ওদের দোষক্রটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৭১]

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী কিছু লোক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় হিজরত থেকে বিরত ছিলেন। মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের যখন সুদিন দেখা দিল, তখন তারা এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলো। ইত্যবসরে পূর্বের মুহাজিরগণ দীনি ইলম ও আমলে অনেক অগ্রগামী হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী মুহাজিরগণ এটি দেখে অনুতপ্ত হলেন এবং তাদের এ পশ্চাদপদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানদেরকে দায়ী করে তাদেরকে শাস্তিদিতে উদ্যত হলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ এবারে তাদেরকে ক্ষমা করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দেন।'[৭২]

অন্যায়-অনাচার, নিপীড়ন-নির্যাতন করা হলে প্রতিশোধ নেয়ার আইনগত অধিকার রয়েছে। তবে তা সমান সমান হতে হবে। কোনো ক্ষেত্রেই কৃত অন্যায়ের বেশি হতে পারবে না। কিন্তু প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়া যে মহানুভবতা ও ঔদার্যের লক্ষণ তা দুনিয়ার সকল মহলে স্বীকৃত। শক্রর প্রতি অনুগ্রহ ও উদারতা প্রদর্শনে রাসূলুল্লাহ (সা) জগতবাসীর নিকট সে আদর্শ রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত কারণে তিনি কারও উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন বলে কোনো নজীর তাঁর কোনো শক্রও পেশ করতে পারবে না।

মক্কার অবিশ্বাসীদের যাতনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক সময় মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল। মক্কার জীবনে এখানকার কাফিররা তাঁর উপর, তাঁর অনুসারীদের উপর ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যে সীমাহীন যুল্ম-নির্যাতন করেছিল তা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবহিত। সর্বশেষে মক্কার কাফিররা তাঁকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলে তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্কা ত্যাগ করেন। সে মক্কায় যখন তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। তিনি ঘোষণা করেন, لاَ تَثْرِيْب عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبوا اَنْتُمُ الطُّلَقَاء 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা সবাই মুক্ত-স্বাধীন।'[৭৩]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদারতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসী ইসলাম বিরোধীদের প্রতি তাঁর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা। উদারতার এমন অপূর্ব দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। মক্কা বিজয়োত্তর বিভিন্ন ঘটনা এর সত্যতা প্রমাণ করে।

অনুরূপভাবে যারা ইসলামের প্রধান শত্রু ছিলেন তাদেরও তিনি ক্ষমা প্রদান করেন। যেমন, সায়্যিদুশ-শুহাদা হামযা (রা)-এর হত্যাকারী ওয়াহ্‌শী, আবূ জাহ্‌লের পুত্র ইকরামা, আবূ সুফিয়ানের পত্নী হিন্দ'া, হুবার ইবনুল আসওয়াদ, সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যাহ্‌, আবূ সুফিয়ানসহ অসংখ্য ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সা) ক্ষমা প্রদান করেন। শুধু তিনি ক্ষমা করে দেননি, আল্লাহ্‌র দরবারে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য দু'আও করেছিলেন। তাঁর দু'আর বাক্য ছিল এরূপ, رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 'হে প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন! তারা বোঝে না।'[৭৪]

ক্ষমা প্রর্দশন সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নীতি ও নির্দেশ অনুসরণ করা আবশ্যক। মানুষ ভুল-ত্রুটি মুক্ত নয়। কোনো কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কাজেই সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা করাই শ্রেয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
>
> 'তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে ধাববান হও যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ন্যায়। যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল উভয় অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ্ নেক্‌কার লোকদের ভালোবাসেন।'[৭৫]

অন্যায়কারীর অপরাধ ক্ষমা করা তাক্‌ওয়া লাভের উপায়। এর দ্বারা মানুষ তাক্‌ওয়ার গুণে গুণান্বিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 'আর ক্ষমা করে দেয়াই তাক্‌ওয়ার অধিক নিকটবর্তী।'[৭৬]

খ. যুদ্ধবন্দীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্ষমা ও উদারতা

যুদ্ধে পরাজিত কঠিন শত্রুপক্ষের অপরাধ ক্ষমা করা, এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কষ্টের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করার কথা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) বলেছেন। কারণ হয়তোবা আল্লাহ্ তাদের শত্রুতাকে ভালোবাসায় রূপান্তরিত করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে ক্ষমার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বলেন,

> وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
>
> 'মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। আর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট আছে। নিশ্চয়ই তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।'[৭৭]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً 'যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'[৭৮]

বনু কুরায়যার বন্দীদের মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) যাবীর ইব্‌ন বাতা এবং আমর ইব্‌ন সা'দ অথবা ইব্‌ন সা'দ-এর মৃত্যু দণ্ড রহিত করেন। তিনি যাবীরকে মুক্তি দিলেন এ কারণে যে, জাহিলী যুগে বুআস যুদ্ধের সময় সে সাবিত ইব্‌ন কায়সকে আশ্রয় দিয়েছিল। তাই তিনি তাকে সাবিতের হাতে তুলে দিলেন যাতে তিনি তাকে তাঁর প্রতি কৃত ইহ্‌সানের প্রতিদান দিতে পারেন। আর আমর ইব্‌ন সা'দকে ছেড়েদিলেন এ জন্য যে, বনী কুরায়যা গোত্র যখন নবী করীম (সা)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সে সময় এ ব্যক্তিই তার গোত্রকে বিশ্বাসঘাকতা করতে নিষেধ করেছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় বন্দী হওয়া জুওয়ারিয়া (রা)সহ তাঁর গোত্রের ছয়শত ব্যক্তিকে ক্ষমা ও মুক্তি দান করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তান'ঈমের দিকে এগিয়ে আসা আশি (৮০) ব্যক্তিক আটক করার পরও তাদেরকে ক্ষমা ও মুক্তিদান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার সময় সাহাবীদেরকে বলতেন, اِسْتَوْصُوا بِالْأَسْرَى خَيْرًا 'তোমরা বন্দীদেরকে সদুপদেশ দান করো।'[৭৯]

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনে আমরা ক্ষমা ও উদারতার অনেক ঘটনা দেখতে পাই। তিনি ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। একবার জনৈক মরুচারী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাদর পেঁচিয়ে টানতে লাগল, ফলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গলায় ফাঁস পড়ার উপক্রম হলো। লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাকে কিছু দাও, রাসূলুল্লাহ (সা) তার দিকে ফিরে হেসে হেসে তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। বিষয়গুলো দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্ষমা ও উদারতার বিষয়টি আমাদের নিকট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। কারণ এটি নৈতিক চরিত্রের একটি উত্তম দিক। আমাদের সকলকে ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

২. ৭. বিনয় ও নম্রতা

ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম বিষয় বিনয় ও নম্রতা। ব্যক্তি জীবনে যে যতো বিনয়ী ও নম্র, সে তত বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। যারা আল্লাহ্র হুকুম পালন করে তারা শ্রেষ্ঠ বিনয়ী ও নম্র এবং তাদের বন্ধু আল্লাহ্। বিনয় ও নম্রতা হলো নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির অলংকার। বিনয় আল্লাহ্র নিকট খুবই পছন্দনীয়। এটি মর্যাদা লাভের একটি বিশেষ গুণ। মানব জীবনের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য বিনয়ী ও নম্র হওয়া আবশ্যক। কারণ, বিনয়ের মাধ্যমে কোনো আবেদন করলে তা অত্যন্ত সফলতার সাথে গৃহীত হয় এবং তার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। বিনয় অবলম্বনকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ الله. 'কেউ যদি আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য বিনয় অবলম্বন করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন।'[৮০]

বিনয় ও নম্রতা শব্দের আরবী প্রতিশব্দ আত্-তাওয়াযু' (اَلتَّوَاضُعُ)। এর শাব্দিক অর্থ ضِدُّ التَّكَبُّرِ، الانخفاض. اَلتَّذلل، اظهار المسكنة 'অহংকারের বিপরীত, নম্রতা, শান্তভাব প্রকাশ পাওয়া।'[৮১] পরিষাভায় বলা হয়, بانَّ يرى نفسه دون غيره في صفة الكمال 'যে পূর্ণাঙ্গ গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও অন্যের নিকট নিজেকে প্রকাশ করে না, তাই বিনয় বা নম্রতা।'[৮২] ফুকীহগণ বলেন, الافتقار بالقلة 'অল্পতে সন্তুষ্ট থাকাই বিনয়ী।' মুহাম্মাদ আলী আত্-থাহানূভী (র) বলেন, تصغير النفس جد مع معرفتها وتعظيم النفس بحرمة التوحيد 'নিজের সম্মান-মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তাওহীদের কারণে নিজেকে খুব ছোট ভাবাকে বিনয়ী বলা হয়।'[৮৩] কারও কারও মতে, ان تخرج من بيت فلا رايت احدا من الناس الارايب انه خير 'বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর রাস্তায় মানুষের কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু না দেখা।'[৮৪]

বিনয় ও নম্রতাকে কখনো দুর্বলতা মনে করা উচিত নয়। মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ অত্যন্ত বিনম্র ও বিনীত ছিলেন। নম্রতা ও বিনয়ের অভ্যাস আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খুবই পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে অহংকার ও বড়োত্ব মনোভাবকে তিনি খুবই অপছন্দ করেন। নবী-রাসূলগণের মাঝে কখনো গর্ব-অহংকার দেখা যায়নি। তাদের কথাবার্তা, চলাফেরা দেখেই বোঝা যেত যে, তারা সত্যিকার অর্থেই মহাজন ও সজ্জন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বিনয়ী বান্দার জন্য আল্লাহ্র দরবারে অবধারিত রয়েছে চিরস্থায়ী মর্যাদা। আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদেরকে বিনয়ের সাথে চলার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا 'দয়াময় আল্লাহ্র খাস বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে।'[৮৫]

মু'মিন ও মুসলমানগণের বৈশিষ্ট্য হলো যে, তারা আচার-আচরণের ক্ষেত্রে নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করে চলে। উদ্ধত ও অহংকার নিয়ে চলাফেরা করা, কথাবার্তা বলা মু'মিনের চরিত্র নয়। এ কারণেই হযরত লোকমান (আ) নিজ পুত্রকে উপদেশ দেন। সে সব উপদেশের মধ্যে তিনি নম্রতা ও বিনয়ের নীতি অবলম্বনের কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ 'হে বৎস! অহংকার বসে তুমি কখনো মানুষকে অবজ্ঞা করো না। আর পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'[৮৬]

মু'মিনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সে যতই ধনদৌলত ও ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাইসে বিনয়ের সাথে তার মনিবের সামনে মাথা নত করে। মানুষের সাথে ভদ্র ও বিনয় আচরণ করে। মু'মিনের বিনয় হয়ে থাকে আন্তরিক বিনয়। এ বিনয় আল্লাহ্ ও তার বান্দাদের সামনে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَّالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ. 'দান দ্বারা সম্পদ কমে না। যে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ্ তাকে সম্মান দান করেন, আর যে বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে উপরে উঠান।'[৮৭]

ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে যেসব রীতিনীতি ও আদত অভ্যাস ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার একটি হলো বিনয়। বিনয়ের অর্থ হলো আল্লাহ্র অন্য বান্দাদের তুলনায় নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ জ্ঞান করা। অর্থাৎ সকল প্রকার গর্ব ও অহংকার থেকে নিজের মন-মানসিকতাকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তদস্থলে পরম বিনয় ও আজিযীকে নিজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করা।

লেনদেনসহ সর্বপ্রকার আচার-আচরণের ক্ষেত্রে বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা প্রদর্শন করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। রাসূলুল্লাহ (সা) আইশা (রা)-কে বলেছেন, إِنَّ اللّٰهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ 'আল্লাহ্ নরম, তিনি নম্রতাকে ভালোবাসেন। তিনি নম্রতার জন্য যা দান করেন, কঠোরতার জন্য অনুরূপ কখনও দান করেন না। অথবা নম্রতা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর উপরই দান করেন না।'

বিনয় ও নম্রতা মু'মিনের যিন্দেগীর ভূষণ। পক্ষান্তরে কুটিলতা হচ্ছে পাপীষ্ঠ হওয়ার নির্দশন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيمٌ 'প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি সরল ও ভদ্র হয়ে থাকে। আর পাপী ব্যক্তি প্রতারক ও নিচু ধরনের হয়ে থাকে।'[৮৮]

নম্রতার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যার মধ্যে নম্রতা নেই সে কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত হয়। আব্দুর রহমান ইব্‌ন হিলাল আল-আব্‌সী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর (রা)-কে থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ 'যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।'[৮৯] জারীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ، حُرِمَ الْخَيْرَ أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ 'নম্রতা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। কিংবা বলেছেন, যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত হবে সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।'[৯০] কানযুল উম্মাল গ্রন্থে বর্ণিত আছে, مَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَجَبَّرُ قَصَمَهُ اللّٰهُ 'যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন আর যে ব্যক্তি অহংকার করবে আল্লাহ্ তার ঘাড় ভেঙে দিবেন।'

নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন মু'মিনগণ পারস্পরিক আচার-আচরণ, লেনদেন, কথা-বার্তায় তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কঠোরতার পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতার নীতি অনুসরণ করা নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন মু'মিনের জন্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং নরম ও কোমল। তিনি প্রত্যেক কাজে নম্রতাকে পছন্দ করেন। কেউ নিজ মনে নম্রতার অনুভূতি পোষণ করলে অন্যের প্রতি ঘৃণা ও বৈরিতা পোষণ করতে পারে না। নম্রতার কারণে মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ 'হে আইশা! তোমার নরম থাকা উচিত। বস্তুত, নম্রতা কোন জিনিসে প্রবেশ করলে তাকে সুন্দর করে এবং নম্রতাকে ছিনিয়ে নেয়া হলে সেই জিনিসটি মন্দে পরিণত হয়।'

বিনয় ও নম্রতা মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা ও ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির মহৌষধ। সর্বদা আমাদের এ মহৎ গুণটির চর্চা ও ব্যক্তি জীবনে এর প্রতিফলন একান্ত প্রয়োজন। আমাদের জীবনসত্ত্বা হতে প্রস্ফুটিত হোক বিনয় ও নম্রতা গুণ।

২. ৮. লজ্জাশীলতা

লজ্জাশীলতা ইসলামী সংস্কৃতির ও নৈতিকতার একটি প্রশসংসনীয় দিক। নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা একটি আবশ্যকীয় গুণ। কারণ লজ্জাহীন ব্যক্তি পশুর সমতুল্য। যার লজ্জা নেই তার ঈমানও নেই। মানুষকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষার উত্তম হাতিয়ার হলো লজ্জাশীলতা। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান নারীদেরকে জাহিলী যুগের নারীদের মত প্রদর্শন করে চলাফেরা করতে নিষেধ করে আয়াত নাযিল করেন। কুরআনে বর্ণিত আছে, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى 'আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়োাবে না।'[৯১]

ক. লজ্জাশীলতার পরিচয়

লজ্জাশীলতা শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হায়া। حَيَاء শব্দটি حَيٌّ শব্দের মাসদার, যা আল-হায়া (اَلْحَيَاء) শব্দ থেকে উদ্ভূত। দোষ-ক্রুটি এবং হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে মানুষের অন্তরে যে সংকোচন ও পরিবর্তন সৃষ্টি হয় তাকেই শরী'আতের পরিভাষায় হায়া বা লজ্জা বলে।

ইব্‌ন মাসকুইয়াহ্ বলেন, اَلْحَيَاءُ هُوَ إِنْحِصَار النَّفْس خَوف إِتيان القبائح، والحذرُ من الدمِّ وَالسَّبِّ الصادقُ 'অশ্লীলকর্ম সম্পাদনের ভর্ৎসনায় ভীতি এবং গাল-মন্দের ভয়ে সত্যবাদী ব্যক্তির অন্তরের সংকোচনের নাম লজ্জা।'[৯২]

সাইয়্যেদ শরীফ আল-জুরজানী (র) (মৃত ৮১৬ হি.) বলেন, هُوَ إِنْقِبَاض النَّفس مِنْ شَيْء، وَتَرَكَهُ حذراً عَنِ اللَّوم فِيْ 'লজ্জা বলে কোনো বস্তু থেকে অন্তরের সংকোচন এবং ভর্ৎসনার ভয়ে কোনো বস্তুকে পরিহার করা।'[৯৩]

জুন্‌নুন আল-মিসরী (র) বলেন, اَلْحَيَاء وجودُ الْهَيْبَة فِيْ الْقَلْب مَعَ وَحْشَةِ مَا سَبَقَ مِنْكَ إِلَى رَبّكَ، وَالْحُبُّ يُنْطِقُ، وَالْحَيَاء يُسْكِتُ، وَالْخَوْف يُقْلِق. 'লজ্জা হলো তোমার সেসব অপকর্ম যেগুলো আল্লাহ্‌র নিকৃষ্ট পৌঁছে গেছে তা বরণ করে অন্তরে ভয় ভীতি সৃষ্টি হওয়া ভালোবাসার মানুষকে স্বরব করে, লজ্জা মানুষকে বাকরুদ্ধ করে এবং ভয়-ভীতি মানুষকে সংদিগ্ধ করে।'[৯৪]

অতএব, এমন ব্যক্তি পূর্ণ চরিত্রবান হবে যার লজ্জা পরিপূর্ণভাবে থাকবে। ব্যক্তির লজ্জা ঘাটতি তার জীবনেরই ঘাটতি স্বরূপ। কারণ, রুহ্ বা আত্মা যখন মরে যায় তখন কোনো নিকৃষ্ট স্বভাবের পীড়া তার অন্তরে অনুভূতির সৃষ্টি করে। কু-স্বভাবের কারণে সে লজ্জাবোধ করে। অনুরূপভাবে উত্তম চরিত্র এবং প্রশংসনিয় গুণাবলী জীবনের শক্তি যোগায়। এর বিপরীত হচ্ছে জীবনী শক্তি ঘাটতি বা স্বল্পতা। আর বীর ও সাহসী ব্যক্তির লজ্জা ভীতু ব্যক্তির লজ্জা, থেকে অনেক বেশি। দানবীর ব্যক্তির লজ্জা কৃপণ ব্যক্তির লজ্জার তুলনায় অধিক। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নির্বোধ ব্যক্তির চেয়ে অধিক। এসব কারণে আল্লাহ্‌র নবীগণের জীবন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ। এমনকি তাদের জীবনীশক্তির কারণে জীবন বা মাটি তাদের দেহকে মিশিয়ে দিতে পারে না। নবীগণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ছিলেন পরিপূর্ণ। এরপর তাদের অনুসারীগণের মধ্যে যারা অধিক লজ্জাশীল তাদের চরিত্র অধিক উন্নত।

খ. লজ্জার প্রকারভেদ

ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যাহ্ (র) বলেন, قُسِّمَ الْحَيَاءُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ 'লজ্জা দশভাবে বিভক্ত।' যথা, ১. অপরাধ জনিত লজ্জা, ২. ত্রুটি-বিচ্যুতি জনিত লজ্জা, ৩. মহত্ত্ব বোধের কারণে লজ্জা, ৪. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লজ্জাবোধ, ৫. প্রভাব জনিত লজ্জা, ৬. নিজেকে ছোট মনে করে লজ্জা, ৭. ভালোবাসা জনিত লজ্জা, ৮. ইবাদত জনিত লজ্জা, ৯. সারাফাত ও সম্মান জনিত লজ্জা ও ১০. নিজ আত্মাকে ত্রুটিযুক্ত মনে করে লজ্জাবোধ করা।'

গ. লজ্জাশীলতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

লজ্জাশীলতা ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম শাখা। সৎ চরিত্র গঠনে লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধ অত্যন্ত জরুরী গুণ। লজ্জা ও সম্ভ্রম মানুষের এমন একটি স্বভাবজাত গুণ যার দ্বারা বহুবিধ নৈতিক গুণাবলীর বিস্তৃতি ঘটে। স্বচ্ছতা ও নির্মলতার বিকাশ সাধিত হয় এবং সকল প্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। লজ্জাহীন ব্যক্তি পশুর সমতুল্য। মূলত যার লজ্জা-শরম নেই তার ঈমানও নেই। শালীনতাবোধ মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও মন্দকাজ থেকে বাঁচানোর উত্তম হাতিয়ার। কারণ যার লজ্জাবোধ নেই সে যে-কোনো অসৎ কাজ করতে পারে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ 'লজ্জা ঈমানের শাখা বিশেষ।'[৯৫] আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক আনসারীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, دَعْهُ فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ 'তাকে ছেড়ে দাও, কেননা লজ্জা হচ্ছে ঈমানের অংশ।'[৯৬]ইমাম মহীউদ্দন আন্-নববী (র) কাযী আয়ায (র) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) লজ্জাকে ঈমানের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যদিও তা অন্তর্মূলে প্রথিত বস্তু। কেননা, কখনও কখনও লজ্জা চরিত্রের অংশ এবং অর্জিত বস্তু হয় যা অন্যান্য সকল নেক আমলের ন্যায়। আর কখনও তা অন্তর্মূলে গ্রথিত থাকে। কিন্তু লজ্জাকে শরী'আতের নিয়ামানুসারে ব্যবহারের জন্য এবং ইলমের প্রয়োজন হয়। অতএব, লজ্জা ঈমানের অংশ। কারণ, তা উত্তম কর্মাবলী এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে।[৯৭] আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও লজ্জার গুণে গুণান্বিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا 'তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল, পরম দয়ালু। বান্দা যখন তার দরবারে মুনাজাতে উভয় হাত উত্তোলন করে তখন তিনি তা খালি ফিরেয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।'[৯৮]

আবূ মাস'উদ উকবাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ 'মানুষ পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী থেকে যে বাণীটি পেয়ে এসেছে তা হলো, যখন তোমার লজ্জাই না থাকল তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।'[৯৯]

লজ্জা মানুষকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। লজ্জাহীন মানুষ নির্বিঘ্নে ভাল-মন্দ সকল কাজ করতে পারে। কোনো কিছুই তাকে মন্দকাজ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) লজ্জাশীলতাকে ঈমানের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ 'ষাট বা সত্তরের অধিক ঈমানের শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বনিম্নটি হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ বিশেষ।'[১০০]

লজ্জাশীল মানুষ পাত্রের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা উজ্জ্বল মুক্তার ন্যায়। লজ্জা-বেষ্টিত ব্যক্তির চরিত্র মাধুর্যের চেয়ে অধিক সৌন্দর্য মণ্ডিত আর কোনো চরিত্র পাওয়া যায় না। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ 'অশ্লীলতা বস্তুকে ত্রুটিযুক্ত করে এবং লজ্জা বস্তুকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে।'[১০১]

পোশাক-পরিচ্ছেদ ও চলাফেরায় শালীনতার অভাব অনেক সময় সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়। ইভটিজিং, ব্যভিচার, অপহরণ ইত্যাদির জন্ম দেয়। এজন্য ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। পর্দার দ্বারা মূলত মানুষের সহজাত সৎ গুণ লজ্জা ও লজ্জাস্থানের হিফাযতের করাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ 'আর মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথায় কাপড় (ওড়না ও চাদর) দ্বারা আবৃত করে।'[১০২]
প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে কোনো অবস্থাতেই অশ্লীল আচরণ, ক্রিয়াকাণ্ড যা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা নষ্ট করে তার কাছেও যাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'আর প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, বেহায়া-অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না।'[১০৩]

উক্ত আয়াতে অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে সব কাজ ও উৎস অশ্লীলতা, পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় তাও পরিত্যাগ করতে হবে। এর মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ অবৈধ মেলামেশা, অভিসার, অশ্লীল গান-বাদ্য, বিনোদন, ম্যাগাজিন, ছায়াছবি ইত্যাদিও শামিল। অতএব, চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, কথাবার্তা, আচার-আচরণে লজ্জাশীল হওয়া প্রয়োজন। সর্বাবস্থায় রুচিসম্মত, ভদ্র, সুন্দর ও মার্জিত গুণাবলীর অনুসরণ করার দ্বারা শালীনতা চর্চা করা যায়। লজ্জাশীলতার ফলে মানুষের মান-সম্মান সুরক্ষিত থাকে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. ৯. ক. সহানুভূতি

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একে অপরের সাহায্য ও নির্ভরশীলতা ছাড়া জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। মানুষের জীবনের সাথে হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিষাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুর্বল ও অসহায় মানুষের প্রতি ক্ষমতাশালী ও বিত্তবানদের সহানুভূতির হাত সম্প্রসারণ করাই হচ্ছে মানবতা। সহানুভূতি একটি মৌলিক মানব আবেগ যা আমাদের একে অপরের সাথে সংযোগ করতে এবং একে অপরের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে শিক্ষা দেয়। এটি একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যা আমাদের অন্যদের অনুভূতি, চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সক্ষম করে, যা ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং দ্বন্দ্ব সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে, সহানুভূতিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণের একটি মূল উপাদান হিসেবে জোর দেওয়া হয়েছে। সহানুভূতির মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে।

খ. ইসলামে সহানুভূতির তাৎপর্য

সহানুভূতি একটি ধারণা যা ইসলামী শিক্ষায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। আল-কুরআনে কয়েকটি আয়াতে সহানুভূতির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 'এবং আমরা আপনাকে (হে মুহাম্মাদ) (সা) বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ব্যতীত প্রেরণ করিনি।'[১০৪] এ আয়াতটি মানুষ, প্রাণী এবং পরিবেশসহ আল্লাহ্র সমস্ত সৃষ্টির প্রতি করুণা ও সহানুভূতি দেখানোর ক্ষেত্রে নবীর ভূমিকার উপর জোর দেয়া হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সা) অন্যদের প্রতি সহানুভূতির জন্য পরিচিত ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ 'গোটা সৃষ্টি (মাখলুক) আল্লাহ্ তা'আলার পরিবারভুক্ত। সুতরাং সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষ প্রিয়, যে আল্লাহ্র পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে তথা সহানুভূতিশীল হয়।'[১০৫]

সহানুভূতি শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং একটি ন্যায়সঙ্গত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্যও অপরিহার্য। ইসলামে, সমাজকে এমন ব্যক্তিদের সমষ্টি হিসেবে দেখা হয় যারা একে অপরের মঙ্গলের জন্য দায়ী। অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানো শুধু ব্যক্তিগত গুণ নয়, সামাজিক বাধ্যবাধকতাও বটে। সহানুভূতি বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান দূর করতেও সাহায্য করতে পারে। ইসলাম তাদের পটভূমি নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের ধারণা প্রচার করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 'হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্র কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক।'[১০৬]

অন্যদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর মাধ্যমে, আমরা বোঝাপড়া এবং শ্রদ্ধার সেতু তৈরি করতে পারি, যা একটি আরও শান্তিপূর্ণ এবং সুরেলা বিশ্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

গ. ইসলামের ইতিহাসে সহানুভূতি

সহানুভূতি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সময় থেকে ইসলামের ইতিহাসের একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ (সা) পশুপাখি এবং পরিবেশসহ আল্লাহ্র সমস্ত সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের অন্যদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হতে এবং আল্লাহ্র সমস্ত সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে শিখিয়েছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে সহানুভূতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বেলাল ইব্ন রাবাহ-এর কাহিনী। বেলাল ছিলেন একজন আফ্রিকান ক্রীতদাস যাকে মক্কায় আনা হয়েছিল এবং একটি ধনী পরিবারের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। তার গাঢ় ত্বকের রঙ এবং আফ্রিকান বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে অন্যান্য দাসদের তুলনায় তার সাথে কঠোর আচরণ করা হয়েছিল। বেলাল যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাথে সদয় ও সম্মানমূলক আচরণ করেন। বেলাল নবীর ঘনিষ্ঠতম সাহাবীদের একজন হয়ে ওঠেন এবং তিনি ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন (যে ব্যক্তি সালাতের জন্য আহ্বান করেন) নিযুক্ত হন। বেলালের গল্পটি তাদের সামাজিক অবস্থান বা পটভূমি নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতির গুরুত্ব প্রদর্শন করে।

পরিশেষে বলা যায়, সহানুভূতি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মঙ্গলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এবং এটি ইসলামী শিক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে। নবী করীম (সা) অন্যদের প্রতি সহানুভূতির জন্য পরিচিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর অনুসারীদের আল্লাহ্র সৃষ্টির সকলের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করতে শিখিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনে সহানুভূতি অনুশীলন করে, আমরা ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি, দ্বন্দ্ব সমাধান করতে পারি এবং আরও ন্যায়সঙ্গত এবং সুরেলা সমাজ তৈরি করতে পারি। সহানুভূতি শুধু একটি ব্যক্তিগত গুণ নয়, ইসলামে একটি সামাজিক বাধ্যবাধকতাও বটে। অতএব, নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি গড়ে তোলা এবং আমাদের সম্প্রদায়গুলোতে এটি প্রচার করা অপরিহার্য।

৩. উপসংহার

মানুষের জীবনের সব কর্মকাণ্ডই ইসলামী সংস্কৃতির আওতাভুক্ত, যা মানবতার আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। যে সব গুণাবলী মানুষকে রুচি ও চেতনাকে জীবনকে সুন্দর করে, সুষমামণ্ডিত করে, শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে, ইসলামের মূল্যবোধলগ্ন সেসব আচারের প্রতিফলনই ইসলামী সংস্কৃতি। এর মূলে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ্র বাস্তবায়িত রূপ। সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা ও সর্বজনীন কল্যাণই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যক্তি জীবন সমাজ-নিরপেক্ষ নয়, হতে পারেনা। সংস্কৃতির মৌল উৎস ব্যক্তি-মানসিকতা, তারও সামাজিক ও সামষ্টিক পরিণতি রয়েছে। তাই ব্যক্তি-সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত হয়ে ব্যক্তির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারেনা। তার বিকাশ, প্রকাশ, সম্প্রসারণ ও পরিব্যপ্তি সমাজ পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী। সমাজে বসবাস করতে হলে অবশ্যই মানুষকে সমাজ প্রত্যাশিত আচরণ করতে হয়। সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষ সামাজিক আচার-আচরণের এক নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা ধারা লাভ করে থাকে। সমাজজীবনে বিচিত্র ও বহুমাত্রিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতির প্রভাবেই মানুষ সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনায়াসে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে। মানুষের অভ্যাস ও রুচিবোধ জাগ্রত ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির কার্যকর ভূমিকা বিদ্যমান। ইসলামী সংস্কৃতি একজন মানুষকে পূর্ণভাবে সামাজিক জীবে পরিণত করে তোলে। একজন ব্যক্তির সামনে তুলে ধরে একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। ব্যক্তির উত্তম গুণাবলী, আচরণ, কল্যাণকামনা, দয়া-মায়া, মহানুভবতা, বিনয়-নম্রতা, লজ্জা, সহনশীলতা ইত্যাদি মানুষকে উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। অপর দিকে ব্যক্তির আচার-আচরণ, সংস্কৃতিই নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যক্তিকে পূর্ণ সামাজিক সদস্যরূপে প্রকাশ করে। পারস্পরিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। পৃথিবীর যেকোনো দেশের সমাজব্যবস্থায় সংস্কৃতির এ ভূমিকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিতর্কের ঊর্ধ্বে। এভাবে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] মুহাম্মদ আবূ হামিদ আল-গাযালী, *ইহ্ইয়াই উলূমিদ্-দীন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল খায়র, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৭৭।

[২] আবূ শায়খ ইস্ফাহানী, *আখ্লাকুন্-নবী (সা)*, অনুবাদঃ মোজাম্মেল হক (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. দশ।

[৩] Dr. Mufti M. Mukarrarm Ahmed, *Encyclopaedia of Islam,* Vol. 1 (New Delhi : Anmol Publications Pvt. Ltd., First Published, 2005), P. 411.

[৪] আবূ বকর জাবির আল-জাযাইরী, *মিনহাজুল-মুসলিম* (কায়রো: মাকতাবাতুর-রিহাব, ১ম সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১১৫।

[৫] *ইহ্ইয়াই উলূমিদ্-দীন*, ৩য় খণ্ড, ১৭৭; সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ১০ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৩।

[৬] মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-আদাবুল-মুফরাদ* (পাকিস্তান: আল-মাকতাবাতুল-আশরিবাহ্, তা.বি), পৃ. ৭৮।

[৭] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দারু ইব্ন হায্ম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরী/২০০২ খ্রি.), কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি আন্নাদ্-দীনা আন্-নাসীহাতু, হাদীস নং ৯৫ (৫৫), পৃ. ৫১; মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরযিমী, *জামি‘উত্-তিরমিযী*

(দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্‌ন হাজার, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), কিতাবুল বিররি ওয়াস্‌-সিলাহ্‌, *বাবু মাজাআ ফিন্‌-নাসীহাতি*, হাদীস নং ১৯২৬, পৃ. ৫৪৯; আহমাদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্‌-নাসাঈ, *সুনানুন্‌-নাসাঈ* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্‌ন হাজার, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), কিতাবুল বায়া'আত, আন্‌-নাসীহাতু লিল-ইমাম, হাদীস নং ৪১৯৭-৪২০০।

[৮] সূরা আত্‌-তওবা, ৯ : ১২৮।

[৯] সূরা আল-আরাফ, ৭ : ৬২।

[১০] পূর্বোক্ত, ৭ : ৬৮।

[১১] পূর্বোক্ত, ৭ : ৭৯।

[১২] সূরা ইয়াসিন, ৩৬ : ২০-২১।

[১৩] পূর্বোক্ত, ৩৬ : ২৬।

[১৪] সূরা আল-হুজরাত, ৪৯ : ১০।

[১৫] মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (রিয়াদ : দারুস্‌-সালাম, ২য় সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), কিতাবুল ঈমান, বাবু কাওলিন্‌-নাবিয়্যে (সা) আদ্‌-দীনু আন্‌-নাসীহাতু, হাদীস নং ৫৭; পৃ. ১৩; কিতাবুল আদাব, বাবু মা ইউনহা মিনাস্‌-সিবাবি ওয়াল-লা'নি, হাদীস নং ৬০৪৪, পৃ. ১০৫৫; কিতাবুল ফিতান, বাবু কাওলিন্‌-নাবিয়্যে (সা) লা তারজি'উ বা'দি কুফ্‌ফারান, ..., হাদীস নং ৭০৭৬, পৃ. ১২১৯; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি আন্নাদ্‌-দীনা আন্‌-নাসীহাতু, হাদীস নং ৯৭ (৫৬), পৃ. ৫১; *জামি'উত্‌-তিরমিযী*, কিতাবুল ঈমান, বাবু মাজাআ সিবাবুল মু'মিনি ফুসূকুন, হাদীস নং ২৬৩৫, পৃ. ৭৩৪; *সুনানুন্‌-নাসাঈ*, কিতাবুল বায়া'আত, কিতাবুল মুসলিমি, হাদীস নং-৪১০৫-৪১১২।

[১৬] সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯: ১২।

[১৭] *সহীহুল বুখারী*, বাবু ইত্তিবা'উল জানাইঝি মিনাল ঈমান, হাদীস নং ৪৬, কিতাবুল আদাব, বাবু মা ইয়ানহা মিনাস্‌-সিবাবি ওয়াললা'নি, হাদীস নং ৬০৪৪, পৃ. ১০৫৫-১০৫৬; কিতাবুল ফিতান, বাবু কাওলিন্‌-নাবিয়্যে (সা), লা তারজি'উ ..., হাদীস নং ৭০৭৬, পৃ. ১২১৯; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি কাওলিন্‌-নাবিয়্যে (সা) সাবাবি ..., হাদীস নং ১১৬ (৬৪), পৃ. ৫৪; *জামি'উত্‌-তিরমিযী*, কিবাতুল ঈমান, বাবু মাজা'আ সিবাবুল মু'মিনি ফুসূকুন, হাদীস নং ২৬৩৫, পৃ. ৭৩৪; *সুনানুন্‌-নাসা'ঈ*, কিতাবুত তাহরীমিদ্‌ দাম, কিতালুল মুসলিমি, হাদীস নং ৪০৩৯; মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজাহ্‌ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্‌* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্‌ন হাজার, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), কিতাবুল ফিতান, বাবু সিবাবুল মুসলিমি ফুসূকুন, ওয়া-কিতালুহু কুফরুন, হাদীস নং ৩৯৩৯-৩৯৪১, পৃ. ৮৬৯-৮৭০।

[১৮] *জামি'উত্‌-তিরমিযী*, বাবু মাজাআ ফী তা'যীমিল মু'মিনি, হাদীস নং ১৯৫৫।

[১৯] *জামি'উত্‌-তিরমিযী*, বাবু মাজা ফিয্‌-যাব্বি আন ইরযিল-মুসলিমি, হাদীস নং ১৮৫৪; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ২৬২৬০, ২৬২৬৪।

[২০] *সহীহুল বুখারী*, বাবু লা ইয়াযলিমুল-মুসলিমু আল-মুসলিমি ওয়ালা ইসলিমুহু, হাদীস নং ২২৬২, বাবু ইমীনির-রাজুলি লিসাহিবিহী ইন্নাহু আখূহু, হাদীস নং ৬৪৩৭; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির ওয়াস্‌ সিলাহ্‌ ওয়াল আদাব, বাবু তাহ্‌রীমিয্‌-যুলমি, হাদীস নং ২৫৮০ (৫৮), পৃ. ১১২১; *সুনানু আবী দাউদ* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্‌ন হাজার, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), কিতাবুল আদাব, বাবু আল-মুওয়াখাত, হাদীস নং ৪২৪৮, পৃ. ৯৬৯; *আল-জামি'উত্‌-তিরমিযী*, বাবু মাজা ফিস্‌-সাতরি আলাল মুসলিমি, হাদীস নং ১৩৪৬।

[২১] *জামি'উত-তিরমিযী*, কিতাবুল ফিতান, বাবু মাজাআ ফিন্‌ নাহয়ী আন সাববির রিয়াহ্‌, হাদীস নং ২২৬৩, পৃ. ৬৩৬-৬৩৭।

[২২] সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ৯।

[২৩] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুত্‌ তাফসীর, বাবু কাওলিহি: ওয়াই'ছিরূনা আলা আনফুসিহিম, হাদীস নং ৪৮৮৯, পৃ. ৮৬৬; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২০৫৪।

[২৪] আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, ২১শ খণ্ড (বৈরূতঃ দরুল ফিক্‌র, তা.বি.), হাদীস নং ১৩৮৬৩, পৃ. ৩৪৬ (পরবর্তীতে এ উৎসটি মুসনাদু আহমাদ হিসেবে ব্যবহৃত হবে); মুসনাদু আবদ ইব্‌ন হুমাইদ, হাদীস নং ১৩৩৩।

[২৫] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল হারছি ওয়াল-মুযারা'আহ, বাবু ইযা কালা: আকফী মুউনাতিন্‌-নাখলি ওয়া গায়রিহি, ওয়া তুশরিকানী ফিছ-ছামারি, হাদীস নং ২৩২৫, পৃ. ৩৭৩; কিতাবুশ্‌ শুরূত, বাবুশ্‌ শুরূতি ফিল-মা'আমালাতি, ২৭১৯।

[২৬] ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত : দারু ইয়াহ্‌ইয়াইত্‌-তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), পৃ. ৫৯।

[২৭] সূরা আস্‌-সাবা, ৩৪ : ৩৯।

[২৮] সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৪৩।

[২৯] সূরা আল-আরাফ, ৭ : ১৫৬।

[৩০] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু রাহমাতিন্‌-নাস ওয়াল-বাহাইমি, হাদীস নং ৬০১১, পৃ. ১০৫১।

[৩১] *মুসনাদু আহমদ*, হাদীস নং ৭০৪১।

[৩২] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু রাহ্‌মাতিল ওয়াদি ওয়া তাকবীলিহি ওয়া মু'আনাকাতিহি, হাদীস নং ৫৯৯৭, পৃ. ১০৪৯।

[৩৩] *জামি'উত্‌-তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস্‌-সিলাহ, বাবু মাজা'আ ফী রাহমাতিল মুসলিমীনা, হাদীস নং ১৯২৪, পৃ. ৫৪৮; সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস্‌-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দা'উদ*, কিতাবুল আদাব, বাবু ফির-রাহমতি, হাদীস নং ৪৯৪১, পৃ. ৯৭৭।

[৩৪] *সহীহুল বুখারী*, বাবু আল-আবারি আলাত্‌-তুরুকি ইযা লাম ইউতাযযা বিহা, হাদীস নং ২৪৬৬; কিতাবুল আদাব, বাবু রাহমাতিন্‌-নাসি ওয়া-বাহাইমি, হাদীস নং ৬০০৯, পৃ. ১০৫১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস্‌ সালাম, বাবু ফাযলি সাকী আল-বাহাইমল মুহতারামাতি ওয়া ইত'আমিহা, হাদীস নং ২২৪৪ (১৫৩), পৃ. ৯৯০।

[৩৫] সূরা আন্‌-নাহল, ১৬ : ১৮।

[৩৬] সূরা আর-রূম, ৩০ : ৫০।

[৩৭] সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৯৫।

[৩৮] সূরা আল-বাকারা, ২ : ২২২।

[৩৯] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪৬।

[৪০] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয্-যুহদি ওয়ার-রিকাক, হাদীস নং ২৯৬৫ (১১), পৃ. ১২৭৪।

[৪১] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুত্ তাওহীদ, বাবু কাওলিল্লাহি তাবারাকা ওয়া তা'আলা : কুলিদ'উল্লাহা আহিদ'উর রাহমানা, হাদীস নং ৭৩৭৬, পৃ. ১২৬৯; ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ খতীব আত্-তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ্* (দিল্লীঃ কুতুব খানায়ে রাশীদিয়্যাহ্, তা.বি.), ১ম অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ৪৯৯৭।

[৪২] সূরা বনী ইসরা'ঈল, ১৭: ২৬।

[৪৩] ড. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান, 'ইসলামের দৃষ্টিতে পারস্পরিক হক : একটি পর্যালোচনা', ৪র্থ সংখ্যা, ইসলামিক স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকা, ২০০৯-২০১০, রাজশাহী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৫০।

[৪৪] *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল-আদাব, বাবু ফিমান ইয়াহ্জুরা আখাহুল-মুসলিমি, হাদীস নং ৪৯১৪, পৃ. ৯৭৩।

[৪৫] *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহ*, পৃ. ২৭৬।

[৪৬] সা'দী আবূ জাইয়্যেব, *আল-কামূলল ফিক্হী* (পাকিস্তানঃ ইদারাতুল-কুর'আন, তা.বি.), পৃ. ১৪৫।

[৪৭] ইমাম নববী, *শারহু সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত্-তাওফীকিয়্যাহ্, তা. বি.), পৃ. ২০১।

[৪৮] *মিনহাজ আল-মুসলিম*, পৃ. ৮১; ইসলামের দৃষ্টিতে পারস্পরিক হক : একটি পর্যালোচনা, পৃ. ৫০।

[৪৯] *শারহু সহীহ মুসলিম*, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১১২-১১৩।

[৫০] মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন*, ১৬শ খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্র, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২২৬।

[৫১] সূরা আন্-নিসা, ৪ : ৩৬।

[৫২] *সুনানুন্-নাসা'ঈ*, হাদীস নং ৯২।

[৫৩] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল-আদাব, হাদীস নং ৫৯৯১, পৃ. ১০৪৮-১০৪৯; *জামি'উত্-তিরমিযী*, কিতাবুল-বিররি ওয়াস্-সিলাহ্, হাদীস নং ১৯০৮, পৃ. ৫৪৫।

[৫৪] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু মান বুসিতা লাহু ফির রিযকি বিসিলাতির রাহিমি, হাদীস নং ৫৯৮৬, পৃ. ১০৪৮; *সহীহ মুসলিম*, বাবু সিলাতির রাহিমি ওয়া তাহ্রীমি কাতী'আতিহা, হাদীস নং (২৫৫৭) ২১, পৃ. ১১১৩; *মুসনাদু আহ্মাদ*, হাদীস নং ১৩৫৮৫; *আস্-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী*, হাদীস নং ১৩২২১।

[৫৫] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল-আদাব, হাদীস নং ৫৯৮৪, পৃ. ১০৪৮; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ ওয়াল আদাব, বাবু সিলাতির্-রাহিমি ওয়া তাহ্রীমি কাতি'আতিহা, হাদীস নং (২৫৫৬) ১৮, পৃ. ১১১৩; *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু ফী সিলাতির-রাহিমি, হাদীস নং ১৬৯৬, পৃ. ৩৫৭।

[৫৬] মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর আর-রাযী, *মুখতারুস্-সিহাহ* (বৈরূতঃ মাকতাবাতু-লুবনান, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৩৯০; ইব্ন মানযূর আল-ইফরিকী, *লিসানুল-আরাব*, ৯ম খণ্ড (বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতু তারীখিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৯৪; মুহাম্মাদ আলী আত্-থাহানুভী, *কাশ্শাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩৬৯; ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আব্দুল মুন'ঈম, *মু'জামুল মুসতালাহাত ওয়াল ফাযলিল-ফিক্হিয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড (কায়রো : দারুল ফাযীলাহ্, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৫১৪।

[৫৭] মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্সান, *কাও'য়াইদুল-ফিক্হ* (ঢাকাঃ ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৩১ হি./১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ৩৮৩।

[৫৮] ড. মুহাম্মাদ রাওয়াশ, ও ড. হামেদ সাদেক, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (পাকিস্তানঃ ইদারাতুল-কুর'আন, তা.বি.), পৃ. ৩১৬।

[৫৯] Thomas Patrick Hughes, *Dictionary Of Islam* (Delhi: Rupa & Co, Fourth Ipression, 1999), Pp. 11-12.

[৬০] সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৭২২-৭২৩।

[৬১] সূরা আল-হিজর, ১৫ : ৮৫।

[৬২] সূরা আল-আহ্কাফ, ৪৬: ৩৫।

[৬৩] সূরা তাগাবুন, ৬৪: ১৪।

[৬৪] সূরা আশ্-শুরা, ৪৩: ৪৩।

[৬৫] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯।

[৬৬] সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৩৭।

[৬৭] সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৯৯।

[৬৮] মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, *তাফসীরে তাবারী*, ১০শ খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৭১৫।

[৬৯] ইব্ন কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৩৫৭-৩৫৮।

[৭০] *সহীহ মুসলিম*, বাবু ইসতিহ্বাবিল 'আফওউ ওয়াত্-তাওয়াদু', হাদীস নং ২৫৮৮।

[৭১] সূরা আত্-তাগাবুন, ৬৪: ১৪।

[৭২] ইব্ন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ১১শ খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৪৯।

[৭৩] ইব্ন হিশাম, *আস্-সীরাতুন্-নাবুবিয়্যাহ্*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৪৩; শায়খ মুহাম্মাদ খিদ্রী বেক, *নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতে সায়্যিদিল মুরসালীন* (দিল্লী : কুতুবখানা ইশা'আতিল ইসলামিয়্যাহ্, তা.বি.), পৃ. ২৩১; ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওযী, *যাদুল মা'আদ*, ৩য় খণ্ড (আল-কাহিরাহ্ : মাকতাবাতুস্-সাফা, ১ম সংস্কলরণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৬৪।

[৭৪] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবু ইসতাতাবাত আল-মুরতাদীন ওয়াল-মু'আতাদীন ওয়া-কাতালাহুম, ইযা আরাদায্-যাম্মি ওয়া গায়রুহু বিসাবাবিন্-নাবিয়্যে, হাদীস নং ৬৪২৯, পৃ. ১১৯২; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্-সিয়ার, বাবু গাযওয়াতুল ওহুদ, হাদীস নং (১৭৯২) ১০৫, পৃ. ৭৯৯; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, কিতাবুল ফিতান, আস্-সাবরু আলাল বিলা, হাদীস নং ৪০২৫, পৃ. ৮৯৫।

[৭৫] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৩-১৩৪।

[৭৬] সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৩৭।

[৭৭] সূরা আশ-শূরা, ৪২ : ৪০।

[৭৮] সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০ : ৭।

[৭৯] সুলায়মান ইব্ন আহমাদ তাবারানী, *আল্-মু'জামুল কবীর* (মুসিল : ইরাক মাতবাআতুয্-যাহরা আল্-হাদীসাহ্, তা.বি.), হাদীস নং ৯৭৭; সুলায়মান ইব্ন আহ্মাদ আত্-তাবারানী, *আল-মু'জামুস্-সাগীর*, তাহ্কীক : মুহাম্মাদ শাকূর মাহমূদ আল-হাজ আমরীর (বৈরূত : আল-মাকতাবা আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১০৮৫ খ্রি.), হাদীস নং ৪০৯; ইবনুল আছীর আল-জাযারী, *আল-কামিল ফিত্-তারীখ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ্, ১ম সং., ১৫২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৯৫।

[৮০] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল-বির্ ওয়াস্-সিলাহ্ ওয়াল-আদাব, বাবু ইসতিহ্বাবিল আযভী ওয়াত্-তাওয়াদি'ই, হাদীস নং ২৫৮৮ (৬৯), পৃ. ১১২৩।

[৮১] ইব্ন মানযূর আল-ইফরিকী, *লিসানুল-আরাব*, ১৫শ খণ্ড (বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতু তারীখিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩২৭; ড. মুহাম্মাদ রাওয়াশ, ও ড. হামেদ সাদেক, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ১৫০; মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্সান, *কাও'য়াইদুল-ফিক্হ*, পৃ. ২৩৯।

[৮২] *কাও'য়াইদুল ফিক্হ*, পৃ. ২৩৯।

[৮৩] *কাশ্শাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।

[৮৪] পূর্বোক্ত।

[৮৫] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৩।

[৮৬] সূরা লুক্মান, ৩১: ১৮।

[৮৭] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল-বির্ ওয়াস্-সিলাহ্ ওয়াল-আদাব, বাবু ইসতিহ্বাবিল আযভী ওয়াত্-তাওয়াদি'ই, হাদীস নং ২৫৮৮ (৬৯), পৃ. ১১২৩।

[৮৮] *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবু ফী হুসনুল আশার, হাদীস নং ৪৭৯০, পৃ. ৯৫৩; *আল-জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মাজা ফীল বাখীল, হাদীস নং ১৮৮৭।

[৮৯] *সহীহ মুসলিম*, ফাযলুর রিফ্ক, হাদীস নং ২৫৯২/৭৫; *সুনানু আবী দাউদ*, বাবু ফির-রিফকি, হাদীস নং ৪৮০৯, পৃ. ৯৫৬; *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, কিতাবুল আদাব, বাবুর রিফ্কি, হাদীস নং ৩৬৮৭, পৃ. ৮১৪।

[৯০] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ ওয়াল আদাব, বাবু ফাযলুর রিফ্ক, হাদীস নং (২৫৯২) ৭৬, পৃ. ১১২৪।

[৯১] সূরা আল-আহ্যাব, ৩৩ : ৩৩।

[৯২] ড. মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল আল-মুকাদ্দাম, *ফিকহুল হায়া* (মাক্কাহ্ আল-মুকাররামাহ্ঃ দারুত্-তাইয়্যেবাহ্, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৮।

[৯৩] *আত্-তা'রীফাত*, পৃ. ৯৪।

[৯৪] *মাদারিজুস্-সালিকীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭০।

[৯৫] *সুনানুন্-নাসাঈ*, বাবু যিক্রু শু'আবিল ঈমান, হাদীস নং ৫০০৬।

[৯৬] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাবুল হায়া মিনাল ঈমান, হাদীস নং ২৪, পৃ. ৭, কিতাবুল আদাব, বাবুল হায়া, হাদীস নং ৬১১৮, পৃ. ১০৬৬।

[৯৭] মুহিউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আন্-নববী, *শারহু সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত্-তাওফীকিয়্যাহ্, তা.বি.), পৃ. ৫।

[৯৮] *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল বিত্র, বাবুদ্ দু'আ, হাদীস নং ১৪৮৮, পৃ. ৩১৪।

[৯৯] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল মানাকিব, বাবু হাদীসুল গার, হাদীস নং ৩৪৮৩, পৃ. ৫৮৭; কিতাবুল আদাব, বাবু ইযা লাম তাস্তাহী ফাসনা' মা শি'তা, হাদীস নং ৬১২০, পৃ. ১০৬৭; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, বাবু হায়া, হাদীস নং ৪১৭৩।

[১০০] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বায়ানু আদাদুন শু'আবুল ঈমান ওয়া আফযালুহা, হাদীস নং (৩৫) ৫৮, পৃ. ৪৪-৪৫।

[১০১] *জামি'উত্-তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ, বাবু মাজাআ ফিল ফুহশি ওয়াত্-তাফাহহুশ, হাদীস নং ১৯৭৪, পৃ. ৫৫৯; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, কিতাবুয্ যুহ্দ, বাবুল হায়া, হাদীস নং পৃ. ৪১৮৫, পৃ. ৯৪২।

[১০২] সূরা আন্-নূর, ২৪ : ৩১।

[১০৩] সূরা আল-আন'আম, ৬ : ১৫১।

[১০৪] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ১০৭।

[১০৫] আহমাদ ইবনুল হাসান আল-বায়হাকী, শু'*আবুল ঈমান*, ৯ম খণ্ড (হিন্দঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. হাদীস নং ৭০৪৮, পৃ. ৫২৩; *মিশকাতুল মাসাবীহ্*, হাদীস নং ৪৯৯৯।

[১০৬] সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৩।